‘আহলে হাদীসে’র বিভ্রান্তি ও সুন্নাতে নববীর আদর্শ

আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক

গত ২৮ মার্চ ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার লালবাগ চৌরাস্তার পার্শ্বে আইম্মায়ে মাসাজিদ, উলামায়ে কেরাম ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে এক বিরাট দীনী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে রাত ১১.০০ হতে ০১.৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ ও সারগর্ভ বয়ানে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বর্তমান লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছিলেন। মূল্যবান বয়ানটি দেশব্যাপী সকল হকপছন্দ ও সত্যানুসন্ধানীর হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রাবেতায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।-সম্পাদক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তথাকথিত আহলুল হাদীস ভাইয়েরা এখানে কিছু অমূলক ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন করে গেছে। আমি তাদের সেসব প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : কবরে প্রশ্ন করা হবে, তোমার দীন কী? কিন্তু কবরে কি প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার মাযহাব কী?

উত্তর : পূর্বের আলোচনায় আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছি যে, মাযহাব ছাড়া দীন পালন করা যায় না। অর্থাৎ গাইরে মুজতাহিদের জন্য মাযহাব না মানলে হাদীস-কুরআনই মানা সম্ভব নয়। সুতরাং মাযহাব মানার অর্থই হল, দীন মানা। কাজেই যে ব্যক্তি মাযহাব মানবে সেই কেবল বলতে পারবে ‘আমার দীন হল ইসলাম’।

যারা মনে করে ইসলাম ও মাযহাব দু’টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় তারা চরম ভুলের মধ্যে আছে।

প্রশ্ন : আমরা তো নিট অ্যান্ড ক্লিন ইসলাম হাতে নিয়ে পালন করছি।

উত্তর : কী অবাস্তব দাবী! একদিকে তারা ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করছে এবং যেসব আমলের ক্ষেত্রে দুই ধরনের সহীহ হাদীস আছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের পছন্দহসই হাদীস ব্যতীত বাকিগুলোকে বেধড়ক অস্বীকার করছে, সাবীলুল মুমিনীন পরিহার করছে আর দাবী করছে, ‘আমরা নিট অ্যান্ড ক্লিন ইসলাম হাতে নিয়ে পালন করছি।’ নিট অ্যান্ড ক্লিন ইসলাম তো দূরের কথা, মুমিনদের পথ বর্জন করার কারণে তারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে আছে কিনা সেটাই ভেবে দেখা দরকার।

প্রশ্ন : মুসাফাহা একহাতে করুন; আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইহাতে মুসাফাহা করেননি।

উত্তর : এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। সহীহ বুখারীর মুসাফাহা অধ্যায় (হা.নং ৬২৬৫) খুলুন। সেখানে সুস্পষ্ট লেখা আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

علمني النبى صلى الله عليه وسلم التشهد و كفى بين كفيه.

অর্থ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দুইহাতে মুসাফাহা করা অবস্থায় তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন।

দুইহাতে মুসাফাহা বিষয়ক আরো হাদীস জানতে দেখুন, ত্বাবারানী কাবীর (হা.নং ৮০৮৬), তা’লীকুত তা’লীক (৫/১২৯), আত-তারীখুল কাবীর (জীবনী নং ১০৮৪), সহীহ বুখারী (২/৯২৬) ইত্যাদি।

অথচ তারা বলছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইহাত দ্বারা মুসাফাহা করেননি। তাদের কী ধারণা! এদেশে কোন আলেম নেই? তারা যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়ালেও প্রতিবাদ করার মত কোন আলেম এদেশে নেই? তারা জেনে রাখুক শুধু এক দুজনই নয়, হক কথা তুলে ধরার মত হাজার হাজার আলেম এদেশে প্রস্তুত আছে। তাদের কাছে অনুরোধ, মিথ্যা ও ধোঁকার পথ পরিহার করুন।

প্রশ্ন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু’টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখলে গোমরাহ হবে না। আর আপনারা বলছেন, দু’টি নয়; চারটি- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস মানতে হবে!?

উত্তর : কুরআন ও সুন্নাহ এ দু’টিতেই তো ইজমা কিয়াস মানতে আদেশ করা হয়েছে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ তখনই পরিপূর্ণ মানা সম্ভব যখন ইজমা ও কিয়াস মানা হবে। আর ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করে কুরআন-সুন্নাহ মানার দাবী করা একেবারেই অমূলক ও অবাস্তব। যা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রায় ৯০% এর অধিক কুরআনের দ্বারা গোমরাহ হয়ে যাচ্ছে। কারণ কুরআনের তাফসীর যথাযথভাবে করা হয় না।

উত্তর : এটাও একটা সুস্পষ্ট মিথ্যা দাবী। হক্কানী উলামায়ে কেরাম সবাই যথাযথ তাফসীরই করেন। একটু আগেই তো আমি ... اطيعوا الله واطيعوا الرسول এই আয়াতের যথাযথ তাফসীর করলাম যে, এই আয়াত দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস চারটি জিনিস মানাই জরুরী প্রমাণিত হয়। আমার তাফসীরের যথার্থতা প্রমাণের জন্য দেখুন– তাফসীরে রূহুল বয়ান (২/৫৮৯), তাফসীরে জালালাইন (১/৩৬৯), আহকামুল কুরআন লিলজাস্সাস (১/৫৬৪), তাফসীরে কাবীর (১/১২৮), তাফসীরু আয়াতিল আহকাম (১/১৩১)। এখানে পাঁচটি তাফসীরের উদ্ধৃতি দিলাম। এটা কি যথাযথ তাফসীর নয়? এখন বলুন, পাঁচ পাঁচটি নির্ভরযোগ্য তাফসীরের রেফারেন্স দেয়ার পর আমরা গোমরাহ প্রমাণিত হলাম, না তারা গোমরাহ প্রমাণিত হল? উক্ত পাঁচটি তাফসীরের কিতাবেই লেখা আছে, শরীয়তের দলীল চারটি। এটাই যথাযথ তাফসীর। এদিকে তাদের দাবী হল, শরীয়তের দলীল দু’টি। অথচ কোন তাফসীরের কিতাবে এটা নেই; এটা মূলত তাদের নিজস্ব তাফসীর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা পাঁচটি কিতাবের রেফারেন্সে তাফসীর করলেও তাফসীর যথাযথ হচ্ছে না। আর তারা নিজস্ব খেয়াল-খুশি মতো তাফসীর করলেও সেটাই যথাযথ তাফসীর হয়ে যাচ্ছে! আল্লাহর পানাহ!

প্রশ্ন : পুরো সৌদি আরবে একজন মুফতী। তাহলে বাংলাদেশে এতো মুফতী কোত্থেকে এল?

উত্তর : আমি জামি‘আ রাহমানিয়ার প্রধান মুফতী। আমার ওখানে ৪০জন শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে অন্তত ২৫/৩০জন মুফতী। এক মাদরাসায়ই এত মুফতী, আল্লাহু আকবার! এতেই ওদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেছে। কারণ একটাই, এ সকল মুফতীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উম্মতের সামনে তাদের সকল মিথ্যা, অবাস্তব, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথার মুখোশ জনগণের সামনে অকপটে তুলে ধরেন।

এছাড়া একথা ভুল যে, পুরো সৌদি আরবে মাত্র একজন মুফতী। আপনারা

যারা হজ্জে গেছেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মসজিদুল হারামে ও মসজিদে নববীতে বিভিন্ন জায়গায় চেয়ারে বসে তালীম করা হচ্ছে। যারা তালীম করছেন তাদের কাছে লোকেরা লিখিতভাবেও ফতওয়া জিজ্ঞাসা করছে, আর তিনি ফতওয়ার জবাব দিচ্ছেন। তো এই তা'লীমকারী মুফতীর সংখ্যা মসজিদুল হারামে ৮/১০জন, মসজিদে নববীতেও ৮/১০জন। তো শুধু এ দুই মসজিদেই তো ২০জন মুফতী আছে। কাজেই পুরো সৌদি আরবে মাত্র একজন মুফতী আছেন একথা নির্জলা মিথ্যা। ওরা হয়তো ধারণা করেছে যে, হানাফীদের কারো হয়তো আরবে যাওয়ার তাওফীক হয়নি; সুতরাং আমরা যা বলবো তাই তারা মেনে নিবে।

প্রশ্ন : মসজিদে কুরআন বাদ দিয়ে কেবল কিতাবের তা'লীম হয়, কুরআনের তা'লীম হয় না।

উত্তর : আপনাদের এখানে সূরা মশক হয় না? অধিকাংশ মসজিদেই তো কুরআন সহীহ-শুদ্ধকরণের প্রশিক্ষণ হয়, কুরআনের তাফসীর হয়। তাহলে কুরআন বাদ দিয়ে শুধু কিতাবের তা'লীম হয় এ জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা তারা বলে কিভাবে?

প্রশ্ন : টুপি সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই।

উত্তর : সহীহ বুখারী (হা.নং ১৩৪) খুলুন। কিতাবুল ইলমের শেষ হাদীস,

ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس ... ولا البرنس.

অর্থ : নবীজীকে জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ যখন ইহরাম ধারণ করে তখন সে কী কী লেবাস পরতে পারবে না? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জামা, পাজামা, পাগড়ি আর টুপি। এগুলো ব্যতিরেকে বাকি সব পরতে পারবে।

তো দেখা গেল, ইহরাম অবস্থায় জামা, পাজামা, পাগড়ি আর টুপি পরা যাবে না। অতএব যারা ইহরাম অবস্থায় নেই তারা কী পরবে? তারা জামা পরবে, পাজামা পরবে এবং টুপিও পরবে।

সহীহ বুখারীতে আমরা টুপির হাদীস পেলাম, আর তারা বলছে টুপি সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই। এছাড়াও হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من القلانس فى السفر ذوات الآذان وفى الحضر المشمرة يعنى الشامية.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় কানওয়ালা টুপি পরতেন। আর সাধারণ অবস্থায় শামদেশীয় টুপি পরতেন। (আল-জামে লিআখলাকির রাবী ওয়াআদাবিস সামি'; পৃষ্ঠা ২০২)

হযরত ফারকাদ রাযি. বলেন,

اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت عليه قلنسوة بيضاء في وسط رأسه.

অর্থ : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেয়েছি এবং তাঁর মাথায় সাদা টুপি দেখেছি। (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা ৪/৩০৯)

শুধু নবীজীই নন সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তৎপরবর্তী গোটা মুসলিম উম্মাহ টুপি পরিধান করে আসছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (১২/৫৪৫, ১০/৫১০), সুনানে আবু দাউদ (হা.নং ৯৪৯), তাবাকাতে ইবনে সা'দ (৫/১২১, ৩/২৩, ৩/২৪৩, ৫/২০৬, ৬/২৬৫, ৬/৩০১, ৬/৩১৪, ৭/১১৬, ৭/২৮৬), সুনানে কুবরা বাইহাকী (হা.নং ২৮৮, ১৯১৮৬), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (৪/৪৪২, ৪/৪৬৪) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : 'মাওলানা' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা অবৈধ। উনারা মাওলানা বলেন কেন?

উত্তর : 'মাওলানা' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা নাকি অবৈধ?! আমি এর বৈধতার স্বপক্ষে কুরআন থেকে দলীল দিব। সহীহ বুখারী থেকেও দলীল দিব। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাহরীমের ৪নং আয়াতে বলেন,

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা নবীজীর মাওলা, জিবরীল আমীন নবীজীর মাওলা, নেককার মুমিনগণ নবীজীর মাওলা। (সূরা তাহরীম-৪)

আল্লাহ তা'আলা এখানে তিন শ্রেণীকে নবীজীর মাওলা বলে উল্লেখ করেছেন। নিজেকে, জিবরীল আমীনকে এবং নেককার মুমিনদেরকে। তাহলে মাওলা শব্দটি কি শুধু আল্লাহর জন্য থাকলো, নাকি ফেরেশতা, মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হল? তাহলে আলেমদের ক্ষেত্রে মাওলানা শব্দের ব্যবহার অবৈধ বলার অবকাশ কোথায়? তারা কি নেককার মুমিন নন?

এবার শুনুন সহীহ বুখারীর (২৬৯৯ নং) হাদীস। মক্কা বিজয়ের সময় নবীজীর নিকট একটি মেয়ে শিশু আসল যার পিতা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। মেয়েটির লালন-পালনের ভার নিতে তিন ব্যক্তি দাবী জানালেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি., জা'ফর রাযি. এবং আলী রাযি.। প্রত্যেকেই দলীল পেশ করলেন যে, আমি এই দলীলের ভিত্তিতে এই মেয়েটিকে লালন-পালন করার হকদার। কিন্তু নবীজী মেয়েটিকে হযরত জা'ফর রাযি. এর হাওয়ালা করলেন। কারণ হযরত জা'ফরের স্ত্রী ছিলেন এই মেয়েটির খালা। আর খালা হলেন মায়ের সমকক্ষ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি খালার কাছে আদর-যত্ন বেশি পাবে। এজন্য নবীজী মেয়েটিকে জা'ফর রাযি. এর কাছে সোপর্দ করলেন। আর বাকী দুজনকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাযি. কে বললেন,

انت اخونا ومولانا.

অর্থ : যায়েদ তুমি তো আমাদের ভাই ও মাওলানা (আমাদের মাওলা)।

আমরা দেখছি যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবী হযরত যায়েদকে মাওলানা বলেছেন। তাহলে আপনারা আলেম, উলামায়ে কেরামকে মাওলানা বললে কি শিরক হয়ে যাবে? কী অবাস্তব সব দাবী!!

প্রশ্ন : বর্তমান তাবলীগ জামাআতের কাজকর্ম কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী।

উত্তর : তাবলীগ-জামাআতের কোন কাজটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী? তারা বেশি বেশি ঈমানের আলোচনা করে এটা? ঈমানের আলোচনা করা কি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী? তারপর তারা নামাযের মাসআলা নিয়ে আলোচনা করে। নামায কীভাবে পড়তে হবে, উযূ কীভাবে করতে হবে, খানার সুন্নাত কি কি, ঘুমানোর সুন্নাত কি কি, মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত কি কি? ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। বলুন এর মধ্যে কোন কাজটা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী?

তারা যে মসজিদে ঘুমায় এটা কি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী? এটাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম বুখারী তো এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র শিরোনাম লিখে একাধিক সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যেসব সাহাবীর বাড়ি-ঘর ছিল না তারা মসজিদে থাকত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৪০-৪৪২)

অতএব মসজিদে থাকা জায়েয না হলে এতজন সাহাবী মসজিদে থাকলেন কী করে? আর তাবলীগওয়ালারা তো আল্লাহর মেহমান। তারা ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে থাকে। পকেটের পয়সা দিয়ে খায় আর আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলে। **(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

মাওলানা সাঈদুয্যামান

১৯৭১ সাল। পূর্ববঙ্গের এক ট্রাজেডিক ক্যালেন্ডার। যুগপৎ ঘৃণা ও ভালোবাসার বৎসর। ডায়েরীতে একাধারে ধ্বংস ও সৃষ্টি এবং বরবাদী ও আবাদির উপাখ্যান। এ ট্রাজেডির শিকার বনী আদমকে ঝরাতে হয়েছে একসাগর রক্ত, বিসর্জন দিতে হয়েছে অজস্র প্রাণ, হারাতে হয়েছে অগণিত মা-বোনের আব্রু-ইজ্জত। বিনিময়ে জন্ম নিয়েছে প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ। ধনী-গরীব, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর সবাই যখন পরাধীনতার বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত, স্বাধীনতার দাবিতে এ দেশের জাগ্রত জনতা যখন সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ, মুক্তির এ সংগ্রাম ব্যর্থ করে দিতে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক তখন মেতে ওঠে জটিল কুটিল ঘৃণ্য এক ষড়যন্ত্রে। বিবেকের দরজায় তালা দিয়ে তারা সহযোগী হয় পাক-হানাদারদের লুট-তরাজ, খুন-ধর্ষণ আর জ্বালাও-পোড়াও মিশনে। তারপর দীর্ঘ নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ধর্ষিত নগর, বিধ্বস্ত জনপদ, দগ্ধ মানবতা, লাশের মিছিল, আর স্বজন হারানোর বেদনাকে সঙ্গী করে যখন দেশ স্বাধীন হল, অবমুক্ত শ্বেত পায়রা ডানা মেলল এদেশের আকাশে তখন শুরু হল মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় সময়ে 'অবদান' শীর্ষক বিতর্ক-বাহাস। মুক্তিযুদ্ধে কার কী এবং কত পরিমাণে অবদান, কালের পরিক্রমায় সে বিতর্কে বহু রাজাকার পেল মুক্তিযোদ্ধার সনদ। আর দেশের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করা নিবেদিতপ্রাণ বহু মুক্তিযোদ্ধা না পেল সম্মান, আর না সম্মাননা। হাজার বছর ধরে এদেশের দল-মত নির্বিশেষ সকলের শ্রদ্ধাভাজন আলেম সমাজের প্রায় সকলেই এ দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু ভুঁইফোড়দের 'আপনা আপনা' ঢাকঢোল আর চিৎকার-চেঁচামেচির সামনে তাদের অবস্থা অনেকটা 'কেষ্টো বেটার' মতো যে, যেখানে যা কিছুই ঘটুক দায়ভার নিরীহ কেষ্টোর ঘাড়েই চাপে। যেখানে পাক-হানাদারদের এদেশীয় সহযোগী রাজাকারদের তালিকা ও অনুসন্ধান বলছে, রাজাকারদের মধ্যে টুপি-দাড়িওয়ালা লোকের চেয়ে দাড়ি কামানো 'আধুনিক' লোকের সংখ্যাই অনেক বেশি ছিল সেখানে দাড়ি-টুপিধারী বিশেষ দলভুক্ত সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধীর কারণে রাজাকারের তকমা লাগানো হয় গোটা আলেম সমাজের নামে। এমনকি অব্যাহত প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মস্তিষ্কে একথা গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, রাজাকার মানেই মোল্লা আর মাওলানা-মৌলভী। এই কারণ যে, আজ কাউকে রাজাকারের প্রতিকৃতি তৈরি করতে বলা হলে সেটা যে টুপি-দাড়িওয়ালা একটা বস্তুই হবে তা হলফ করেও বলা যায়। কিন্তু আর দশটা ঘটনা দুর্ঘটনার মতো রাজাকারীরও যে একটা বাস্তব ও সত্য ইতিহাস আছে একথা একশ্রেণির লোক কেন যেন ইচ্ছা করেই বুঝতে চান না। আসলে নিরীহ লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার অনায়াস ও নিরাপদ উল্লাস থেকে কে বঞ্চিত হতে চায়!

সত্যের খাতিরে আসুন, আমরা খতিয়ে দেখি, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উলামায়ে কেরামের অবদান এবং রাজাকারের খতিয়ান।

প্রিয় পাঠক! স্বাধীনতার ইতিহাস সংরক্ষণ ও চর্চার ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হল, 'মুক্তিযুদ্ধে কার কী অবদান' এ নিয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার নামে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করা। উচিত তো ছিল দলমত নির্বিশেষে স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও যথার্থতা খতিয়ে দেখা। যে সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ত-পিপাসু ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংঘটিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ, আমরা কি আজ মানুষখেকো সেই দানবদের কবল থেকে মুক্ত? নাকি মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে 'স্বাধীনতা'র নামটিই উপহার দিয়েছে কেবল।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উচিত ছিল, প্রতিটি জনগণের সর্বদা দেশের উন্নতি ও জাতির ঐক্য নিয়ে কথা বলা। এতদ্বসত্তেও 'অবদান' শীর্ষক আলোচনা যদি করতেই হয় তবে তা পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ হওয়া ছিল ইতিহাসের দাবী। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় 'অবদান' অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ চর্চা না থাকার ফলে কিছু নিরীহ মানুষের অবদান ঢালাওভাবে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়। যার ফলে দীন-ধর্ম বিমুখ নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কিংবা তার আগে পরে দেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম যারা জনসাধারণ্যে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণে অবিরাম কাজ করে গিয়েছেন, তাঁদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মনে করে। অথচ ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উলামায়ে কেরামের অসংখ্য অবদান ও কীর্তিগাথা খুঁজে পাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উলামায়ে কেরামের অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উলামায়ে কেরামের অবদান পর্যালোচনার দু'টি দিক রয়েছে।

প্রথমটি হল, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেয়া।

তো ৪৭'এর দেশ বিভক্তিতে উলামায়ে কেরামের কি অবদান ছিল তা পাকিস্তান জন্মের শ্লোগানেই অনুমেয়। [পাকিস্তান কা মতলব কিয়া? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ']। সাধারণত পাকিস্তানের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা ড. ইকবালকে বলা হয়, কিন্তু বাস্তবতা হল, পৃথক রাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা হযরত থানবী রহ. এর চিন্তা-প্রসূত ছিল। তিনি বলতেন, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হয়ে যেন চিরকাল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ইন্দুরকলে আবদ্ধ না থাকে বরং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে এর জন্য একটি পৃথক দেশ অপরিহার্য– যার নাম পাকিস্তান। (সূত্র : বিস্ বড়ে মুসলমান)

কিন্তু পরবর্তীতে দেশ বিভক্তি নিয়ে মুসলিম জনসাধারণ এবং বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। যা পরবর্তীতে খণ্ড-অখণ্ড ভারত উভয় পক্ষাবলম্বীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। অর্থাৎ যারা অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন বিভক্তির পর তারা ভারত বিরোধী বিবেচিত হলেন না। আর যারা বিভক্তির পক্ষে ছিলেন তারাও স্বীয় দাবী অনুসারে কমপক্ষে পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। উভয় পক্ষেই নেতৃত্বে ছিলেন উলামায়ে কেরাম। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ হল, যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়, তখন (পূর্ব পাকিস্তান) বাংলাদেশের ঢাকায়

স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ.। আর পশ্চিম পাকিস্তানে পতাকা উত্তোলন করেন মুফতী শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.। তারা উভয়ে পাকিস্তানের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর আত্মীয়, শাগরেদ ও তাঁরই মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন।

আরেকটি প্রমাণ হল, সিলেট ও বেলুচিস্তানের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি। যদিও এ দু'টি অঞ্চলে অখণ্ডভারতের পক্ষাবলম্বী শীর্ষ পর্যায়ের নেতা হযরত মাদানী রহ.-এর শিষ্যরা বেশি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের রোডম্যাপ ও সীমান্ত নির্ধারণের সময় যে রেফারেন্ডমের [গণভোট] আয়োজন করা হয়, তাতে ভারতবিভক্তির পক্ষাবলম্বী মাওলানা আতহার আলী রহ. ও মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ.এর প্রচারণা ও গণসংযোগে সিলেটে এবং মুফতী শফী রহ. এবং শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ.এর প্রচারণা ও গণসংযোগে বেলুচিস্তানে বিভক্তির পক্ষ বিজয়ী হয়। ফলে এ দু'টি অঞ্চল পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত হতে সক্ষম হয়।

প্রিয় পাঠক! উলামায়ে কেরামের এসব অবদান যদি না থাকত, তবে পাকিস্তান গঠন করা অসম্ভব ছিল। আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রশ্নই আসত না। এর প্রমাণ হল, উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান গঠনের গণসংযোগে আরো কিছু অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এর একটি হল, ভূস্বর্গ কাশ্মীর। অপরটি পূর্ব পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, জুনাগড় ইত্যাদি। এগুলো ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। পূর্ব পাঞ্জাব, হায়দারাবাদ, জুনাগড়ের শাসক ছিলেন নিজাম গোষ্ঠী। বিভক্তি ও অখণ্ডতার প্রশ্নে কাশ্মীর ও নিজামশাসিত অঞ্চলেও রেফারেন্ডম (গণভোট) হয় এবং সেখানে অখণ্ড ভারতের পক্ষ বিজয়ী হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর এক চপেটাঘাতে এক সপ্তাহের ভেতর নিজামের স্বপ্নের স্বায়ত্বশাসন তছনছ হয়ে যায় এবং হিংস্র কুকুরের সামনে পরাভূত বিড়ালের ন্যায় হায়দারাবাদ ভারতের অধীনে চলে আসে। অপরদিকে কাশ্মীরিরা যখন তাদের 'অখণ্ড' ভুল উপলব্ধি করতে পারল, ঝিলামের পানি তখন জলে পরিণত হয়েছে। সেই থেকে এ যাবৎ লাখো মানুষের রক্তে লাল হয়েছে ঝিলমের জল, কিন্তু স্বাধীনতার লাল সূর্য তাতে রেঙে ওঠেনি। তাই নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, ৪৭ সালে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনসাধারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের এ অংশকে বিভক্ত না করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল কল্পনাই থেকে যেতো। এদিকে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তির চেতনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, বিশেষত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তিনিও যাদের হাতে রাজনীতি ও আন্দোলনের দীক্ষা নিয়েছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম হলেন মওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানী। যিনি ৪৭'এ ভারত বিভক্তির পক্ষে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিলেন। সুতরাং এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, একাত্তরের স্বাধীনতার ভিত ৪৭' সালেই রচিত হয়েছিল। আর সে ভিত্তি-বুনিয়াদ যারা রচনা করেছেন এবং বুকের তাজা রক্তের নজরানায় নিরাপদ রেখেছেন তারা হলেন উলামায়ে কেরাম। অতএব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় উলামায়ে কেরামের এ অবদান ভুলে গেলে তা অসম্পূর্ণ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত ইতিহাস বলে বিবেচিত হবে। সঠিক ইতিহাস জানলে, তাঁদের এ অবদানকে জাতি কখনো ভুলবে না।

প্রিয় পাঠক! উলামায়ে কেরামের অবদানকে স্মৃতি থেকে হটিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র নতুন নয়। বরং ইংরেজ খেদাও আন্দোলনেও আমরা একই চিত্র দেখতে পাই।

সৈয়দ আহমদ শহীদ- ইংরেজদের ইতিহাসে যাকে ধর্মান্ধ, ডাকাত, ভণ্ড, লুটেরা বলা হয়, শ্রী রতন লাহিড়ী তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'যার জীবন স্মৃতি প্রেরণা যুগিয়েছিল যুগে যুগে মহান বিপ্লবীদের, যার জীবনাদর্শ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে থেকে আক্রমন করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সেই সঙ্গে দেশের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা– তা পথ দেখিয়েছিল পরবর্তীকালের মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ, এম.এন রায়, রাস বিহারী এমনকি নেতাজীকেও। কে এই মহাবিপ্লবী? যার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সহস্র মানুষ প্রাণ দিয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে। শত সহস্র মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু। কে ইনি? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে তার নামোল্লেখ না থাকলেও তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর স্কুল-কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয়, সে সব ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত ও বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। (ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস; পৃষ্ঠা ৭-৯)

শ্রী সত্যেনসেন লিখেছেন, রাজত্ব হারাইয়া মুসলমানগণই সর্বপ্রথম বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। এ সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ওয়াহাবী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বইয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী রহ. এর আন্দোলনের সূত্র ধরে পরিচালিত ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছেন– যাদের উপর নির্ভর করে ইংরেজরা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল, তারা ছিল ইংরেজ শাসনের দ্বারা সৃষ্ট কিছু অনুগত (হিন্দু) রাজা, মহারাজা ও জমিদার। উদাহরণ স্বরূপ বর্ধমানের মহারাজা মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজদের প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। (পৃষ্ঠা ২৯)

সত্য বলতে কি, ইংরেজ বিতাড়নে যখন মুসলমানরা উঠে পড়ে লেগেছিল, তখন হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের গুরু ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের 'বৃটিশের জয়' শ্লোগানে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না। তিনি লিখেন,

চিরকাল হয় যেন বৃটিশের জয়
বৃটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়।
ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বলে সবে বৃটিশের জয়।

বৃটিশের কবল থেকে উদ্ধার করা দিল্লী যখন পুনরায় হাতছাড়া হয় ঈশ্বরচন্দ্র তখন লিখেন,

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার

ইংরেজ সরকারের অনুরূপ খেদমত হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এমনকি বহু দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও করেছেন। একদিকে হিন্দুরা বৃটিশরাজের জয়ের শ্লোগানে মত্ত অপরদিকে আলেমদেরকে আগুনে পুড়তে হয়েছে, দিল্লীর চাঁদনী চক থেকে খায়বার পাস পর্যন্ত গাছে গাছে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে।

সারকথা, বহু রক্ত আর ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময় রেঙে উঠেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য। ত্যাগ ও কুরবানীর সেই ইতিহাসে গান্ধী, নেহেরু, সুভাষবসু, চিত্তরঞ্জনের নাম যেখানে আছে, সেখানে

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, সৈয়দ আহমাদ শহীদ, সৈয়দ ইসমাঈল শহীদ, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর মত বিশিষ্ট নামগুলো কেন বাদ গেল? একমাত্র কারণ, উলামায়ে কেরামের অবদানকে জাতির কাছ থেকে আড়াল করে দেয়া। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ইতিহাস চেপে রাখা যায় না।

৭১'এর মুক্তিযুদ্ধে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা

একাত্তরে ইসলামী দল ছিল মোট তিনটি। ১. জামায়াতে ইসলামী। ২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। ৩. নেযামে ইসলাম পার্টি।

জামায়াতে ইসলামী সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। আর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছিল। নেযামে ইসলাম পার্টির কারো বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ বিরোধিতার অভিযোগ তুলতে পারেনি।

কিন্তু ইসলামপন্থী ও ইসলামের অনুসারী সবাই কি ইসলামী দল করতেন? পরিসংখ্যানে দেখা যাবে, আজও এ দেশে ৯৫% মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক (কওমী মাদরাসা ক্ষেত্রবিশেষে আলিয়া মাদরাসাও) রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। তাদের একাংশ থাকেন মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে ব্যস্ত। কেউ তাবলীগ করেন, কেউ বা খানকায় আত্মশুদ্ধির খেদমতে রত থাকেন। হিসাব করলে শতকরা সর্বোচ্চ ১০ ভাগ উলামায়ে কেরাম পাওয়া যাবে যারা সে সময় সরাসরি ইসলামী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন হল রাজনীতিতে জড়িত নয় এমন অবশিষ্ট আলেমরা তখন কী করেছিলেন?

এর সহজ উত্তর হল, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সুউচ্চ আশা নিয়ে উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান গঠন করেছিলেন, একদিকে চোখের পলকে তা ভেঙ্গে যাওয়াটা যেমন তারা মেনে নিতে পারছিলেন না, এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পাকিস্তানের পতনের পর এ দেশের উপর তৎকালীন মিত্রশক্তি ভারতের চেপে বসার আশঙ্কা (যার কিছুটা হায়াদারাবাদ ও কাশ্মীরের সাথে তার আচরণ দ্বারা অনুমিত হয়েছিল) কিংবা অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমানদের নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হওয়ার চিত্রাবলী নতুন করে তাজা হওয়ার আশঙ্কা কাজ করছিল অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের ক্ষমতার উচ্চাভিলাস, এদেশের জনগণের প্রতি বিমাতা-সুলভ আচরণ, পাহাড়সম বৈষম্য-নীতি, অধিকারের দাবী তুললেই জেল-জুলুম এসবও সহ্য করে নেয়ার বিষয় ছিল না। এ উভয় সংকটে উলামায়ে কেরামের অধিকাংশই ছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উলামায়ে কেরাম এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছেন। যেমনটি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের এক সাক্ষাৎকারে তার দাদার বিবরণে পাওয়া যায়। (দেখুন : হাজার প্রশ্নে হুমায়ূন আহমেদ)

অপরদিকে কতেক উলামায়ে কেরামের মতে যেহেতু ৭১'এর এ যুদ্ধ ছিল নরপিশাচ, রক্তপিপাসু জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের মরণথাবা। আর ইসলাম যেহেতু জালেমের সমর্থন করে না, তাই জালিমশাহীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা এবং দেশকে তাদের কবল হতে মুক্ত করাকে তারা জরুরী বলেছেন। যেমন, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিয়ত সেক্রেটারি মুফতী মাহমুদ ২৬শে মার্চের আগে ঢাকায় আসলেন। তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দদের বলে গিয়েছিলেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলুন। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও হযরত থানবী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হাফেজ্জী হুযূরও রহ. মাতৃভূমির পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং স্বীয় ভক্তবৃন্দ ও মুরীদগণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলী তার 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে' বইয়ের ভূমিকায় মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আড়াইহাজারীর উদ্ধৃতিতে লিখেন, 'আমি হাফেজ্জী হুযূরের খুব ভক্ত ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অনেক ছাত্র ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমি হাফেজ্জী হুযূরের কাছে পরামর্শ চাইলাম, আমিও ট্রেনিংয়ে যাব কি না, বা এখন আমি কী করব? তিনি আমাকে বললেন, পাকিস্তানীরা বাঙ্গালিদের ওপর অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম কখনো এক হতে পারে না। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, ইসলাম মানো, তবে পাকিস্তানের পক্ষে যাবে কীভাবে?' (বিস্তারিত দেখুন : আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে)

এছাড়া আলেমগণ সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত না হলেও তারা পাক-হানাদারদের জুলুম থেকে এদেশের জনগণ বিশেষ করে নিজেদের প্রতিবেশী সংখ্যালঘু হিন্দুদের জান-মাল রক্ষার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য ও কার্পণ্য করেননি। কারো বিশ্বাস না হলে আজও নিজ নিজ এলাকার প্রবীণ হিন্দু নাগরিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।

প্রিয় পাঠক! মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নীরবতা কিংবা অস্ত্রধারণ না করা এক বিষয়, আর হিংস্র লালসায় ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠা আরেক বিষয়। এ দেশের উলামায়ে কেরাম হয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বা সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন, নতুবা চুপ থেকেছেন। স্বার্থান্বেষী অসৎলোক ছাড়া কোন হক্কানী আলেমকে ন্যায়নিষ্ঠ বিচারে কেউ রাজাকার তথা লুণ্ঠন-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধে সহযোগী প্রমাণ করতে পারবে না। তবুও কি নতুন প্রজন্ম টুপি ও শ্মশ্রুধারী কাউকে দেখলে রাজাকার বলে গাল দেবে? আলেম বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা মুস্তফা আযাদ যুদ্ধ শেষে যখন শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. প্রতিষ্ঠিত গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় ভর্তি হলেন, কিছুদিন পর দেখলেন যে, মাদরাসা হতে দু'জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের অপরাধ গোপালগঞ্জে রাজাকারী ট্রেনিং নিয়ে তারা হানাদারদের সহযোগী হয়েছিল। (দেখুন : আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে; পৃষ্ঠা ৪৭৮)

মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ে গিয়ে পাথর কণার আঘাতে চক্ষু হারান এবং এভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

জামি'আ ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসা। বাংলাদেশের দীনী জ্ঞান বিতরণের এক প্রাচীন বিদ্যাপীঠ। মুক্তিযুদ্ধের বহু স্মৃতি আজও অক্ষত আছে পটিয়া মাদরাসায়। তার এটাই আর্তচিৎকার, আমি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা; দালাল বা হানাদারদের নই। মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাটে বেতারের সরঞ্জামাদির নিরাপত্তা নিয়ে যখন দিশেহারা, তখন পটিয়া মাদরাসার আলেমদের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে ঠাঁই নেন। সবার যত্ন ও আদর আপ্যায়নে তিনি সেখানে নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু দালালদের অপতৎপরতায় মেজর জিয়া সদলবলে পটিয়া মাদরাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরিণতিতে অসহায় পটিয়া মাদরাসার উপর বোম্বিং করে হানাদাররা পটিয়া মাদরাসার প্রাসাদতুল্য ভবন গুড়িয়ে দেয়।

পটিয়ার আরেক এলাকা ফাজিল খাঁর হাটের দৌলতপুর গ্রামের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুস সুবহান। যিনি ৫২ ও ৭১'এর আন্দোলনে **(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

কুরআনী শিক্ষার বদৌলতেই ছিল ভারতবর্ষে মুসলমানদের উত্থান ও সম্মানজনক অবস্থান

মাওলানা তাফাজ্জুল হুসাইন

ভারত একটি হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র। যা আমাদের বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় পঁচিশ গুণ বড়। এক সময় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান– একত্রে এই তিন ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলা হতো। সে যুগে এই তিনটি ভূখণ্ড একসঙ্গে ছিল। ভারতবর্ষে পূর্ব হতেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু ছিল। ভারতবর্ষের বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলমানগণই একমাত্র সংখ্যালঘু জাতি যারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও প্রায় সাতশত বছর (৯৬২খ্রি.-১৭৫৭ খ্রি.) রাজত্ব পরিচালনা করেছে। অথচ তার পূর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মাত্র নব্বই বছর (৮৭১খ্রি.-৯৬২খ্রি.) রাজত্ব পরিচালনা করেছে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ বেনিয়ারা ধোঁকাবাজি, শঠতা, প্রতারণা, অস্ত্র ও পেশিশক্তি ব্যবহার করেও মাত্র একশত নব্বই বছর (১৭৫৭খ্রি.-১৯৪৭খ্রি.) ভারতবর্ষ শাসন করতে সক্ষম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সংখ্যালঘু মুসলমানগণ সুদীর্ঘ সাতশত বছর পর্যন্ত কিভাবে এমন দৌর্দণ্ড প্রতাপের সাথে এদেশ শাসন করতে সক্ষম হলেন। অথচ তাদের না ছিল অস্ত্র ভাণ্ডার, না ছিল পেশী শক্তির ব্যবহার আর না ছিল বেসামাল অর্থের যোগান। তাহলে কোন শক্তিবলে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজেদেরকে এদেশের শাসন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল? পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থে (১১৫ নং পৃষ্ঠা) এর কারণ হিসেবে লিখেছেন– ইউরোপের উদ্দেশ্য হল, সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্য বা মুসলমানদের উদ্দেশ্য হল, সকলকে আমাদের সমান করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায় হল তলোয়ার। আর্যদের উপায় হল শিক্ষা ও সভ্যতা। (সূত্র : চেপে রাখা ইতিহাস; পৃষ্ঠা ২১)

ভারতের ইতিহাস সম্বলিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে আরব থেকে আগত মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের প্রবেশদ্বার মাদ্রাজের মালবার অঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে উল্লেখ আছে, 'মালবারের মুসলমানদেরকে মোপলা বলা হত। এই মোপলারা ছিল অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, কর্মক্ষম এবং বর্ধিষ্ণু। তারা আবার সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। তারা দেখতে সুশ্রী। তাদের ন্যায় পরিশ্রমী দ্বিতীয় কোন জাতি ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সাহসিকতায় তারা চির প্রসিদ্ধ। আরবীয় ধর্মমতে দীক্ষাদানই তাদের প্রধান কাজ। তারা শ্মশ্রু ধারণ করে, কেশ কর্তন করে, সকলেই মস্তকে টুপি পরিধান করে, তারা স্বভাবত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মালবারের প্রাচীন নাম চেরর বা কেরল। সেখানে তখন দশটি স্থানে মসজিদ ছিল। প্রতিটি মসজিদেই মুসলমানদের কুরআনী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। (সূত্র : বিশ্বকোষ ১৪/৬১৮, চেপে রাখা ইতিহাস; পৃষ্ঠা ৩৫)

উক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলমানদের কুরআনী শিক্ষা, উদারনীতি, অসাম্প্রদায়িকতা এবং উত্তম আদর্শই তাদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে শাসন-ক্ষমতার সুযোগ করে দিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম, গোত্র-বর্ণ সকল শ্রেণীর মানুষই তাদেরকে আপন করে নিয়েছিল। এছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব যুগেই উলামায়ে কেরাম, ওলী-বুযুর্গগণ নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে কুরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজ করেছেন এবং আজও করে যাচ্ছেন। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবেন। সেই ভিত্তিতেই তৎকালীন ভারতবর্ষে কুরআনের শিক্ষা, মক্তব এবং প্রভাতী মক্তবের গুরুত্ব এত অধিক ছিল যে, কোন মুসলমান নিজ সন্তানের জন্য সকাল বেলা কুরআন শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে অন্য কাজ করা হারাম মনে করতেন।

ভারতে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কুরআনী শিক্ষার প্রচারে কাজ করেছিলেন শাইখ ইসমাঈল ও শাইখ আলী উসমান ওরফে দাতা গঞ্জবখ্‌শ (মৃত্যু ১০৭২ খ্রি.)। তাদের দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা, আমল-আখলাক এতই উন্নত ছিল যে, শুধু মুসলমানই নয়; বরং হিন্দুরা পর্যন্ত তাদের জন্য পাগলপারা ছিল। ভারত ভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের বাৎসরিক মাহফিলে ভক্তি জানাতে অসংখ্য হিন্দুরাও ভিড় জমাতো। তাদের এই কঠোর মুজাহাদার ফলে বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্যন্ত কুরআনের আলো ছড়িয়েছেন। যিনি হাফেযে কুরআন এবং একজন দরবেশ প্রকৃতির আলেম ছিলেন। (সূত্র : চেপে রাখা ইতিহাস; পৃষ্ঠা ৬০)

মোটকথা, তৎকালীন ভারতবর্ষে কুরআনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ফলে মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার, চিন্তা-চেতনা, পোশাক-আশাক, চলাফেরা, আমল-আখলাক সবই ছিল উন্নত, আদর্শ, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

ব্রিটিশ বেনিয়া-ইংরেজ কর্তৃক কুরআনী শিক্ষা বন্ধের অশুভ পরিণতি

ভারতবর্ষে সুলতানী আমলে (সৈয়দ, তুঘলক, লোধি প্রমুখ) ও মোঘল আমলে মুসলমানদের মধ্যে কুরআনী শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনই ছিল না। এসব ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মাদরাসা থেকে শত শত বছরে শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরামকেই সে সময় সমাজে শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হত। সরকারী সকল অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সকল আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে উমিচাঁদ, রায়বল্লভ ও মীর জাফর প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ দস্যু লর্ড ক্লাইভের হাতে স্বাধীন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের পর এদেশের জনগণ ব্রিটিশ বেনিয়াদের গোলামীর শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শুরু হয় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার। নেমে আসে আলেম সমাজের উপর জুলুমের ঘোর অমানিশা। তবে এত কিছুর পরও মুসলমানদের জিহাদী স্পৃহা দমন করা তো দূরের কথা, ইংরেজদের প্রতি সাধারণ জনগণের ঘৃণা বাড়তেই থাকে। এক পর্যায়ে ইংরেজরা অনুধাবন করল হত্যাযজ্ঞ, জেল-জরিমানা, মিথ্যা মামলা ও জুলুম-নির্যাতনে মুসলমানদের জিহাদী উদ্যম নষ্ট করা যাবে না। এই বীর জাতিকে দমন করতে হলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ। এছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই। আর

যেহেতু নৈতিক শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, সুস্থ সংস্কৃতি জাতির চালিকা শক্তি এবং ঈমান-আকীদা মুসলমানদের রক্ষাকবচ, তাই এ তিনটি বিষয় ধ্বংস করে দিতে পারলেই মুসলমানদের ধ্বংস করা সম্ভব। তাহলে মুসলিম জাতি আর কোন দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না।

এ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ইংরেজরা সর্বপ্রথম মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র মাদরাসাগুলোকে বন্ধ করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। যদিও এদেশে মুসলমান সুফী-সাধকদের আগমনকাল থেকেই মাদরাসা শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল সীমিত আকারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। পরবর্তীতে মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ইলম পিপাসু দরবেশ বাদশাহ আলমগীরের শাসনকালে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ভালোভাবে পরিচালনার জন্য বহু সরকারী সম্পত্তি মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দেয়া হয়। এর ফলে উপমহাদেশের আনাচে কানাচে, অলি-গলিতে বহু মাদরাসা স্থাপিত হয়। শুধু বাংলা মুলুকেই তৎকালীন সময়ে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় আশি হাজারের বেশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রথম মাদরাসা শিক্ষার জন্য দানকৃত সকল ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দান বন্ধ করে দেয়। যার ফলে তাদের জীবিকার পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এতে করে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্ম নেয় যে, মাদরাসার শিক্ষার্থীরা খাবার পায় না, অভাবী হয়। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আজও পর্যন্ত ধনীদের নসীবে ইলমে দীন শিক্ষা করার সুযোগ আসে না।

আগ্রাসী ইংরেজ শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হল না; বরং মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি চিরতরে খতম করার মানসে ইউরোপীয় কালচার বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনাসহ বহু ধরনের অশ্লীল, অসভ্য সংস্কৃতি আমদানী করা শুরু করল। এমনকি এই অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটাতে তার সকল উপায়-উপকরণগুলোকে সরকারীভাবে সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করে ফেলল। ফলে যুবসমাজকে আদর্শচ্যুত করে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করা অতি সহজ হয়ে গেল।

তাছাড়া ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী প্রচুর অর্থ-কড়ি দিয়ে এন.জি.ও ও খ্রিস্টান মিশনারীদের মাধ্যমে অশিক্ষিত, গরীব, অসহায়, বিধবা, বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার কাজ চালু করে দিল। এজন্য তারা এক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতক, চাটুকার লোক তৈরি করে নিল, যারা মুসলমান হয়েও ইংরেজদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে সেবাদাস হয়ে কাজ করবে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানো মুসলমান ইংরেজদের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের কবলে দিশেহারা হয়ে পড়ল। বহু মুসলমান ঈমান-আকীদা নষ্ট করে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে শুরু করল। এমনই সময় আল্লাহ তাআলা ইংরেজ ফেরআউনী শক্তিকে উৎখাতের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দের মাধ্যমে কুরআনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে মুসা আ. এর ভূমিকায় ময়দানে নামালেন। যার ফলে সত্যের জয় হল, মিথ্যার অবসান ঘটল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান এবং কুরআনী শিক্ষা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও সাফল্য

ইংরেজদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের অক্টোপাসে মুসলমান যখন ঈমানহারা হতে শুরু করল, তরুণ সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছল, সর্বোপরি ভারতবর্ষের জনগণ নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকার হারিয়ে দীন-দুনিয়ার সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগল, তখন দেশ, খেশ, মাতৃভূমি, জাতিসত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক হক্কানী উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির মূলোৎপাটনে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হল পূর্ব বাংলায়। সুফী-সাধক মীর নেছারুদ্দীন তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগ্রাম চলল পশ্চিম বাংলায়। তাছাড়া সৈয়দ আহমদ শহীদ ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. এর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হতে লাগল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। এভাবে আন্দোলনের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল সর্বত্র। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে সংঘটিত হল ঐতিহাসিক মহাবিদ্রোহ। কিন্তু ক্ষমতালোভী, প্রবল শক্তিশালী, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অল্প সময়ের মধ্যে এ মহাবিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। তাদের এই সফলতার পেছনে বাস্তবে ভারতীয় কিছু গাদ্দার আমলা, শিখ, মারাঠা এবং মুনাফিক, মুশরিক হিন্দু জমিদারদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মাহবিদ্রোহে যেহেতু হক্কানী উলামায়ে কেরামের অংশগ্রহণ ছিল নেতৃত্বের পর্যায়ে এবং কর্মীর ভূমিকায় ছিল সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাই ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী উলামায়ে কেরাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আক্রোশ নিয়ে ধ্বংসাত্মক অভিযান চালাতে শুরু করল। ব্যাপকহারে মুসলিম নিধন, লুণ্ঠন, ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোজন, ধর্ষণ, জমি-জমা বাজেয়াপ্তকরণ-সহ সকল প্রকার পাশবিক ও দানবীয় হিংস্রতায় মেতে উঠল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত মুসলমানের রক্তে হোলিখেলা চলতে লাগল। দিল্লি, কলিকাতা, ঢাকা, পিন্ডিসহ প্রধান প্রধান রাজপথ ও শহর হয়ে গেল কারবালা। কলিকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত শেরশাহসুরী গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডে এমন কোন বৃক্ষ ছিল না, যাতে কোন আলেমকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়নি। শুধু তাই নয়, ইংরেজ লাল কুকুরেরা যে গ্রামেই কোন আলেমের আশ্রয় নেয়ার সংবাদ পেয়েছে সে গ্রামকেই ভস্মীভূত করে দিয়েছে। শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, সুস্থ-অসুস্থ কেউই রক্ষা পায়নি ইংরেজ দানবের হিংস্র থাবা থেকে। শত-সহস্র আলেমকে মাল্টা, কালাপানি, আন্দামান দ্বীপের অন্ধকারাগারে মানবেতর জীবন কাটাতে হয়েছে। জুলুম-নির্যাতন, হত্যা আর অগ্নি সংযোগের ধ্বংসলীলা চালিয়েও ইংরেজ শাসকেরা থেমে থাকেনি। তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ইবাদতখানা মসজিদগুলো ঘোড়ার আস্তাবল, ফৌজি ছাউনী ও গীর্জায় পরিণত করেছিল। বন্ধ করে দিয়েছিল প্রভাতী মক্তবসহ সকল কুরআনী শিক্ষা কেন্দ্রগুলো।

ক্রমবর্ধমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা, চিন্তাশীল, অতন্দ্রপ্রহরী আলেম সমাজকে ভাবিয়ে তুলল। এবার রণ কৌশল পরিবর্তনের ফিকির। দেশ, জাতি ও ইসলাম রক্ষার দরদ ও অধীর আগ্রহ, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আহ্ ধ্বনি, রাতের আহাজারী, দু'আ ও ইস্তিখারার পর শামেলী প্রান্তরে নেতৃত্ব দানকারী হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ স্বাধীনতা

আন্দোলনের নতুন কৌশল হিসেবে উপমহাদেশের সকল অলি-গলিতে, প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে, পাড়ায় পাড়ায় কুরআনী মকতব ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র 'মাদরাসা' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এসব দীনী প্রতিষ্ঠান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে জনগণের স্বেচ্ছাদানকে পুঁজি করে ইসলাম ও দেশ-জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ একঝাঁক মর্দে মুজাহিদ তৈরি করে যাবে।

উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দে দারুল উলূম নামে একটি মাদরাসা তথা কুরআনী শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা হয়। এই দারুল উলূম দেওবন্দই হল সারা দুনিয়ার ইলমে নববীর বর্তমান ঘাটি, কওমী মাদরাসার মাইলফলক বা আদর্শ।

দারুল উলূম দেওবন্দ ইসলাম ও মুসলমানদের হিফাযত, সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির অপসারণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতার সূর্য উদয়ন, মুসলমানদের শিক্ষা-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতির লালন ও বিকাশসহ বহুবিধ কর্মসূচী নিয়ে দিবানিশি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে শুরু করল। যার ছাত্র-শিক্ষকের গুণাগুণ হবে এমন যারা দরসের আসনে একেকজন বিজ্ঞ দার্শনিক ও পণ্ডিত, রণাঙ্গনে মর্দে মুজাহিদ, রাতের আঁধারে রোদনকারী সিজদানশীন দরবেশ। এরই ফলশ্রুতিতে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারত-পাকিস্তানের বিভাজনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আবারো এদেশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয় শহর-নগর-বন্দরে, পল্লীগাঁয়ের পথে প্রান্তরে। (সূত্র : ৩০ সালা স্মারক; পৃষ্ঠা ৭১, দেওবন্দ আন্দোলন)

স্বাধীনতা অর্জনের পরও সংগ্রামী সাধক, উলামায়ে কেরাম এক মুহূর্তের তরে আরাম-আয়েশ বা ভোগ-বিলাসের জন্য বসে থাকেননি। অক্লান্ত পরিশ্রম আর নজিরবিহীন মুজাহাদা, প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, আপনজন সবকিছু ত্যাগ করে হলেও দীন কায়েমের মানসে দুর্বার গতিতে তারা এগিয়ে চলেছেন। তারা মনোবল হারাননি, ভুলে যাননি পূর্বসুরী সাহাবীদের জীবনাদর্শ।

তাইতো দেখা যায়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগের পর ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিষয় ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা। তৎকালীন নিয়মানুসারে সকলের জন্যই স্কুলে পড়া ছিল বাধ্যতামূলক। সে হিসেবে সরকারী বা বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করা ছিল জরুরী। অন্যদিকে উর্দূ শিক্ষা মৌলিকভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। যা কিছু বাকি ছিল তাতে দেব-দেবী, মূর্তি পূজার আলোচনাই ছিল বেশি, যা মুসলমানদের দৃষ্টিতে সরাসরি শিরক ও কুফর। এই করুণ অবস্থা ও বিপদসঙ্কুল শিরকী শিক্ষা চিন্তাশীল মুসলমানকে ভাবিয়ে তুলল। ইতোমধ্যে একজন প্রভাবশালী বুযুর্গ এ্যাডভোকেট কাযী আদিল আহমাদ আব্বাসী (মৃত্যু ১৯৮০ খ্রি.) মুসলমানদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় লালিত করতে একটি স্কিম তৈরি করলেন। তার স্কিম ছিল, মুসলমান বসতিগুলোতে প্রাইমারী শিক্ষার জন্য মকতব প্রতিষ্ঠা করা এবং এতে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, নাযেরা এবং উর্দূ ভাষায় দীনিয়াত শিক্ষা দেয়া। প্রয়োজনানুপাতে প্রাইমারীর অন্যান্য বিষয় অংক, ইংরেজি, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ারও ব্যবস্থা রাখা। মকতব পরিচালনার দায়িত্ব বসতির মুসলমানগণ এমনভাবে পালন করবে, যেভাবে তারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-শাদীর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কাযী আদিল সাহেব সহজতর একটি পদ্ধতি বের করলেন এবং তা প্রয়োগ করে নিজ এলাকায় সুনামের সঙ্গে সাফল্য অর্জন করলেন। পদ্ধতিটি ছিল– ঘরে ঘরে মুষ্টি চাউল উঠানো এবং মৌসুমী ফসল ও ফলমূল কালেকশনের ফর্মুলা। মরহুম কাযী সাহেব তার এ মিশন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চালু করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উক্ত মকতবের উদ্যোগে বাস্তি জেলায় মাহফিলের আয়োজন করেন। মাহফিলে এই নতুন পদ্ধতির কুরআনী শিক্ষার উপর জোরদার আলোচনা করা হয়। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে বিদগ্ধ আলেম, সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা মনযুর নু'মানী রহ. আগমন করেন। উক্ত স্কিম ও মিশন পরিদর্শন করে মাওলানা মনযুর নু'মানী রহ. অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পরবর্তীতে মাওলানা আলী মিয়াঁ নদবীকে সভাপতি ও কাযী আদিল আহমাদকে মহাসচিব করে বাস্তি জেলা শহরে 'দীনী শিক্ষা কাউন্সিল উত্তর প্রদেশ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগঠনের অধীনে ইউপির জেলাগুলোতে 'আঞ্জুমানে তা'লীমাতে দীন' নামে শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেন হাজারো মুসলমান নিজ নিজ এলাকায় উক্ত নিয়মে মকতব প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। বর্তমান ভারতের বিশ কোটি মুসলমানের কুরআনের স্পর্শ লাভে ধন্য হওয়া সেই স্কিমেরই ফসল। (সূত্র : মাওলানা মনযুর নু'মানী কৃত আমার জীবনকথা; পৃষ্ঠা ৭০)

গত এক বছর পূর্বে বিবিসি'র রাতের সংবাদে ত্রিপুরা বা অন্ধ্র প্রদেশের এক জেলার সংবাদ পরিবেশন করা হয়। সংবাদে বলা হয়, সেখানে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুসলমান ছেলে-মেয়ে সকলেই জেনারেল শিক্ষার জন্য স্কুলে যায়। আবার ঐ স্কুলেই বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সকল ছেলে-মেয়ে বাধ্যতামূলক কুরআন-হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বিবিসি'র পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রশ্ন করা হল, তোমরা একই স্কুলে একবেলা জেনারেল শিক্ষা অপর বেলা দীনী শিক্ষা গ্রহণ উভয়টি একসঙ্গে কেন কর? জবাবে বলা হল, জেনারেল শিক্ষা গ্রহণ করি বৈধভাবে চাকুরী বা ব্যবসার মাধ্যমে দুনিয়ার প্রয়োজন রুজি-রোজগার করতে। আর দীনী শিক্ষা গ্রহণ করি মুসলমান হিসেবে ফরয জ্ঞান আহরণ করে পরকালে জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

ফের এনজিও ও পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কবলে কুরআনী শিক্ষা এবং তার সুদূর প্রসারী কুফল

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা পেয়ে প্রায় দুইশত বছর রাজত্ব করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। উলামায়ে কেরাম, মুসলিম জনসাধারণ ও কিছু দেশপ্রেমিক হিন্দু জনতার গণপ্রতিরোধের মুখে ১৯৪৭ সালে এদেশ থেকে তারা লেজ গুটাতে বাধ্য হয়। সে সময় এই ভূখণ্ডকে খ্রিস্টরাজ্য বানানো ছিল তাদের মূল টার্গেট। ১৯৪৭ সালে তাদের সেই টার্গেট ও স্বপ্ন ভঙ্গের পর তারা ফের এদেশে আগমনের একটি মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এজন্য তাদেরকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনের নামে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, সিডর, টর্নেডোর মত সংকটপূর্ণ সময়ে পুনর্বাসন ও সহযোগিতার নামে সেবার ছদ্মবেশে তারা পুনরায় আগমন শুরু করে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশে।

এবার তাদের টার্গেট হল পর্যায়ক্রমে উপমহাদেশের পঞ্চাশ কোটি ধর্মপ্রাণ

মুসলমানের কাঁধে ইসরাঈলের ন্যায় একটি বিষফোঁড়া চাপিয়ে দেয়া। যাতে এ দেশের বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। এজন্য বর্তমানে এনজিওরা এ দেশের মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, হাসপাতাল-ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা, ফ্রি চিকিৎসা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী প্রদান, জন্ম নিবন্ধন, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়নসহ হাজারো চটকদার ফর্মুলা ও স্কিম নিয়ে মরিয়া হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ সকল মিশনের মূল লক্ষ্য অতি গোপনে সরলমনা মুসলমান ও উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করা যাতে বাংলাদেশের পার্বত্য ও সংযুক্ত সীমান্ত অঞ্চলে গণভোটের মাধ্যমে নিরাপদে একটি খ্রিস্টরাজ্য কায়েম করা যায়।

ভারতের সুপ্রিম কাউন্সিলের বিশিষ্ট মন্ত্রী স্যার চার্জটিরান লর্ডন অত্যন্ত জোর গলায় বলতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সকলে একসঙ্গে খ্রিস্টান হয়েছিল তেমনিভাবে ভারতবাসীরাও একসময় সকলে খ্রিস্টান হয়ে যাবে।

বর্তমানে এদেশে প্রায় ৫৫ হাজার এনজিও কর্মরত রয়েছে। তাদের অধিকাংশই খ্রিস্টানদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে পরিচালিত হচ্ছে। যার ফলে গত চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টায় ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা প্রায় এক কোটিতে পৌঁছেছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে সারাদেশে প্রতি ২.৫৫টি গ্রামে একটি করে এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। যা এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। (সূত্র : সেবার নামে এনজিওদের ষড়যন্ত্র; পৃষ্ঠা ৩৯)

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের মূল শিক্ষা কুরআনী তালীম বন্ধ করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে সারা বাংলাদেশে ব্র্যাক নামক এনজিও প্রায় ৬০ হাজার ছোট-বড় স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, পাঠশালা চালু করেছে। এসব স্কুল, কিন্ডার গার্টেন ও পাঠশালায় ভোরবেলা ক্লাস চালু করে তারা মুসলমানদের সন্তানদেরকে স্কুলমুখো করে দিচ্ছে। ফলে মুসলমানদের হাজার বছরের ঐতিহ্য সকালবেলা মসজিদে গিয়ে কুরআন শিক্ষা করা বা মক্তবে পড়া থেকে মুসলিম সন্তানেরা বঞ্চিত হচ্ছে।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হল, বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে এনজিওরা সরাসরি কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে। মাদরাসার সবকিছু বাহ্যিকভাবে ঠিক রেখে ভেতরে ভেতরে খ্রিস্টবাদের বই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ ও রংপুরের কিছু এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে এমনটি দেখা গেছে।

মোটকথা, এনজিওর মাধ্যমে সেবার আড়ালে কাজ হাসিল করা ইংরেজদের নতুন অপকৌশল। তারা এ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অঙ্গনসহ সকল ক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আজ মুসলমানের ঘরে নাস্তিক-ব্লগার পয়দা হচ্ছে। নারী সমাজ বেপর্দা-বেহায়াপনার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। সকালের কুরআনী মক্তব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর ব্যাঙের ছাতার মত দ্রুত গজিয়ে উঠছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন। এসবই এনজিওদের সেবাদানের সামান্য নমুনা।

কুরআনী শিক্ষার উপর অমুসলিমদের শ্যেন দৃষ্টি : তাদের ষড়যন্ত্র মুকাবিলার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তব উপায়

তৎকালীন ভারতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিচার ব্যবস্থা ছিল ইসলামী শরীয়াভিত্তিক। এজন্য কুরআন-হাদীসের আলিম হওয়া ও ফিকহ শাস্ত্রের চর্চা ও তাতে বুৎপত্তি অর্জন করা সকলেই অত্যন্ত জরুরী জ্ঞান করতো। ফলে এ দেশের গণমানুষের জীবনে সাড়ে ছয়শত বছর ধরে চলতে থাকে ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআনী শিক্ষার একটানা অনুশীলন ও বাস্তবায়ন। উক্ত বিষয়কে পুঁজি করেই মনুষ্যত্ব, মানবপ্রেম, মানবিক দায় এবং সৃষ্টজীবের প্রতি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে ইসলাম প্রচারক সুফী-সাধক, উলামায়ে কেরাম ও মাশাইখগণ নযীরবিহীন ত্যাগ ও মুজাহাদার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তির উপর এ দেশের মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক অবকাঠামো তৈরি করেছিলেন এবং মসজিদ-মাদরাস কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি সমাজ, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত সবকিছুই অভিজ্ঞ আলেম ও ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞ মুসলিম দ্বারা পরিচালিত হত। সবকিছুর ভালো-মন্দ নিরূপিত হত কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে। প্রখ্যাত দার্শনিক মুহাম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, 'ষাটের দশকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মাথায় টুপি না থাকাটা বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। একজন বয়স্ক মানুষের মুখে দাড়ি না থাকলে ধরেই নেয়া হতো সে একজন হিন্দু। কোন নারী বেপর্দায় চললে তার বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিত। তখনকার একেকজন আলেম অত্যন্ত বিজ্ঞ, পরহেযগার, ইসলাম দরদী ও এমন জনদরদী ছিলেন যে, একজনই এক এক জেলা বা শহরের জন্য যথেষ্ট ছিলেন। তৎকালীন আলেম সমাজ ছিলেন অত্যন্ত সম্মানী ও ভক্তির পাত্র; সমাজের প্রাণপুরুষ ও মধ্যমণি। সে সময় কল্পনাও করা যায়নি যে, মুসলমান দীন-দুনিয়ার কোন ব্যাপারে 'নফস-পরস্তি' করে আলেমকে অবজ্ঞা করবে।'

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, অতি ক্ষীণ গতিতে হলেও সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরো ঘটতে যাচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন এমনিতেই শুরু হয়নি; বরং এর বিষাক্ত বীজ আজ থেকে তিনশত বছর পূর্বেই পশ্চিমা অপশক্তি এবং ক্রুসেডররা বপন করে রেখেছিল। যা এখন ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। সে বীজ হল বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন।

ইসলাম ও উলামায়ে কেরামের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধের নেয়ামতকে ধ্বংস করার জন্য তিনশত বছরেরও বেশি সময় ধরে কৌশলগত যুদ্ধে বিশ্ব মোড়ল ঔপনিবেশিক শক্তি, খ্রিস্টান মিশনারী ও ওরিয়েন্টালিস্টদের সম্মিলিত বাহিনী বিভিন্ন ফ্রন্টে আক্রমণ পরিচলনা করে আসছে। তাদের কৌশলগত আক্রমণের মূল দিক দশটি বলে বিবেচনা করা যায়।

(১) ফরাসী বিপ্লব ও তার পরবর্তী যুগে তারা ধর্মীয় অনুশাসন তথা গীর্জা বা চার্চের প্রভাবকে ব্যক্তি জীবনে শুধু চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই একই ফর্মুলায় তারা ইসলাম ধর্ম ও তার আদর্শকে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে পৃথক করে শুধু ব্যক্তি জীবনের চার দেয়ালের খাঁচায় বন্দি করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেলেছে এবং এর স্বপক্ষে জনমত ও মুসলমান তল্পিবাহীও প্রস্তুত করে নিয়েছে।

(২) আধুনিকতা ও ফ্যাশনের নামে মুসলিম উম্মাহকে ইউরোপের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করা। যারা যতো বেশি পাশ্চাত্যের অনুসারী হবে তারা ততো বেশি ফ্যাশনেবল বলে আখ্যায়িত হবে।

(৩) ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ভোগ-সুখের একচ্ছত্র মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে পারিবারিক অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলা। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন উঠিয়ে দেয়া।

(৪) বস্তুবাদের প্রসার ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে আখেরাতের অদৃশ্য বিষয়াবলীর বিশ্বাস থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয়া।

(৫) ভোগবাদের প্রচার চালিয়ে মানুষকে ভোগ-বিলাসিতায় মজিয়ে তাদেরকে মনুষ্যত্বহীন করে উদর ও শরীর পূজারী বানিয়ে দেয়া।

(৬) নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাকস্বাধীনতা, নাস্তিকতা ও লাগামহীন যুক্তিচর্চার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কুরআন-হাদীস, নবী-রাসূল, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি সম্পর্কে কটুক্তির সুযোগ করে দেয়া।

(৭) নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা দর্শন। যার মূল হল উন্নত যোগাযোগ ও স্যাটেলাইট ব্যবস্থায় পুরো বিশ্বকে একটি পল্লী বা একটি এলাকার মত করে দেয়া এবং সারা বিশ্বের জনবলকে এক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, কৃষ্টি-কালচারে একীভূত করে ফেলা। যার মডেল হবে ইউরোপ।

(৮) নতুন বিশ্বায়নের জন্য মুসলিম দেশগুলোতে তাদের ফর্মুলা হল– ধর্মনিরপেক্ষতা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা মুক্তবুদ্ধি চর্চা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনোদন ও ফ্যাশন, যৌন উদ্দীপক পর্ন ওয়েবসাইটের প্রসার।

(৯) তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে মুসলমানকে কাবু করা।

(১০) নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের নামে নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা এবং যুবসমাজকে ইসলামী শক্তির বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব এমনকি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্নকারী তাগুতের যে তাণ্ডবলীলা চলছে তা যদি যথাযথ প্রজ্ঞা ও সুনিপুণ কৌশলে মুকাবিলা করার যোগ্যতা অর্জন করা না যায় অথবা শত্রুর মোকাবেলায় সমপাল্লার হাতিয়ার যোগাড়ের ফিকির ও পদক্ষেপ না থাকে তবে এই দাবানল অচিরেই সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করবে। তখন আর করার কিছুই থাকবে না। আমরাও নতুন বিশ্বব্যবস্থায় তাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাব। তবে আল্লাহ চাইলে এ সবের কিছুই আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তাদের সকল অব্যর্থ নিশানা ব্যর্থ হয়ে যাবে– এটা যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি আমরাই যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন না চাই তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থারও পরিবর্তন করবেন না। এটা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শাশ্বত বাণী। তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদেরকে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী-

(১) মুসলমান ভাইদের, নিজেদের এবং নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্রের নিরাপত্তার জন্য সালাতুল হাজত, তওবা-ইস্তিগফার, রোনাযারী, উম্মতের ফিকির ও দরদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

(২)দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা রেখে, উদারপন্থী মনোভাব নিয়ে সুন্নাতে নববীর মূর্তপ্রতীক হয়ে জাতির খাদেম হওয়ার চেষ্টা করা।

(৩) প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে, প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় নূরানী মকতব ও মসজিদ ভিত্তিক প্রভাতী মক্তবের ব্যবস্থা জোরদার করা।

(৪) প্রতিটি দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্সুস বিশিষ্ট কওমী মাদরাসায় ইফতা, উলূমুল হাদীস, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, ইত্যাদি বিভাগগুলো ৫ বছর মেয়াদী করে চালু করা। প্রয়োজনে মেধাবী ও যোগ্য ছাত্রদেরকে ভাতা প্রদান করে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরির এবং কিতাবাদি রচনার ব্যবস্থা করা এবং জাতির প্রয়োজন অনুধাবন করে যুগোপোযুগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৫) শক্তিশালী নিজস্ব দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাসহ প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা। (সূত্র : ৩০ সালা স্মারক; পৃষ্ঠা ২২৮)

(৬) দাওয়াতুল হক ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে জনগণ এবং আলেম সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ সৃষ্টি করা।

(৭) স্বায়ত্ব শাসিত কওমী ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা।

লেখক : শিক্ষা সচিব, আল জামি'আ মদীনাতুল উলূম মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা, শিকদার মেডি ডেন্টাল কলেজ রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা। ইমাম ও খতীব, পুলপাড় জামে মসজিদ, জাফরাবাদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

অল্প কথা গল্প নয়

মক্কা-মদীনার টুকরো স্মৃতি

দিল্ মা-ন্‌তা নেহী

'সেদিন আমারও এসেছিল জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ। কিন্তু জান্নাতের মালিকের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। আহা ছুঁই ছুঁই জান্নাতটি কেমন হাতছাড়া হয়ে গেল!'– এই অভিব্যক্তি ১১ সেপ্টেম্বর ক্রেন বিধ্বস্ত হওয়ার সময় বাইতুল্লাহর মাতাফে উপস্থিত একজন হাজী সাহেবের। শোনে এই গোনাহগারেরও আপাদমস্তক কেঁপে উঠেছিল। ভাবছিলাম, ইনি মানুষ, না ফেরেশেতা; ওলী, না আবদাল! লোকজন যেখানে ওই ঘটনা নিয়ে 'কিভাবে, কেন এবং কার দোষে' বিষয়ক আলোচনায় ব্যস্ত এবং এর ওর সমালোচনায় মুখর– সেখানে বলে কী এই আল্লাহর বান্দা! মরতে পারেনি বলে জান্নাত নাকি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে হা হয়ে গেলাম। কিছু মানুষের কাছে মৃত্যু তাহলে এতোটাই কাঙ্ক্ষিত ও কাম্য এবং এমন মানুষ এখনো আল্লাহর যমীনে হাঁটাচলা করে! জান্নাতও বোধহয় এদের প্রতীক্ষায় বে-চাইন হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, ভাই ছাহাব! সারা জীবন দু'আ করেছি মক্কা-মদীনার পবিত্র ভূমিতে যেন আমার কবর হয়। আসার সময় সবার কাছ থেকে সেভাবেই বিদায় নিয়ে এসেছি। প্রৌঢ়ত্বে এসে কল্পনাতীতভাবে হজ্জের তাওফীক পাওয়ায় ভেবেছিলাম মনের আশাটি এবার বুঝি পুরা হয়। কিন্তু হল আর কৈ, আবারও বোধহয় খোদার যমীনে গোনাহগার দেহটা বয়ে বেড়াতে হবে। দরদ ও মহব্বতের অনুভব-অনুভূতি সম্পর্কে অপরিচিত আমি জান্নাতপাগল এই মানুষটিকে আমার মত করে সান্ত্বনা দিলাম– ভাই ছাহেব! আমাদের জীবন ও মৃত্যু আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। শুভ, সুন্দর ও শাহাদাতের মৃত্যু আমরা কেবল কামনা করতে পারি এবং তা অর্জনে চেষ্টা-কোশেশ করে যেতে পারি। আমাদের আমলী যিন্দেগী তাঁর পছন্দ হলে জান্নাতী মওত আমাদেরকেও তিনি দান করবেন ইনশাআল্লাহ। বান্দার মনের সমস্ত কামনা-বাসনা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। বান্দার কিসে মঙ্গল হয় সাধারণত সেদিকে লক্ষ্য করেই তিনি ফায়সালা করে থাকেন। আমাকে আপনাকে জান্নাতী মওতের পেয়ালা থেকে আপাত বঞ্চিত করায় তাঁর হয়তো অন্য কোন ইচ্ছা রয়েছে। এখনও আমরা আরাফায় গোনাহমাফির দস্তরখানে হাজিরা দেইনি, মুযদালিফার ক্ষমার চাদরে এখনো হইনি আবৃত, উপভোগ করিনি জামারায় পাথর মেরে শয়তানকে পরাভূত করার আনন্দ-আহ্লাদ। হয়তো এতো সব উপভোগ্য বস্তু বরাদ্দে আছে বলেই এখনো আমরা বিচরণ করছি আল্লাহর পাক যমীনে বাইতুল্লাহর ছায়ায়। হতাশ হবেন না, হয়তো পাপ-পঙ্কিলতা সাফ-সুতরো করেই তিনি আমাদেরকে জান্নাতের তোহ্‌ফা প্রদান করবেন ইনশাআল্লাহ। কথা শেষ হতেই ঈর্ষণীয় মানুষটি কেমন ঘোর লাগা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। মাতাফের সদা বহমান স্রোতে মিশে যেতে যেতে তার শেষ কথা ছিল– 'বাত আপকি সাহী, লেকিন দিল্ মা-ন্‌তা নেহী।' **(চলবে ইনশাআল্লাহ)**

আবূ সাফওয়া

বাংলার কালজয়ী মুজাদ্দিদ মুফতিয়ে আযম

আল্লামা ফয়যুল্লাহ রহ. : জীবন ও কর্ম

মাওলানা আব্দুল হামীদ খুলনাবী

সময়ের প্রয়োজনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। নবুওয়াতী ধারার ইতি টেনে অব্যাহত রেখেছেন নিয়াবতে নবীর অবিচ্ছেদ্য ধারা। সেই মুবারক সিলসিলায় যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন এমন কিছু কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব, যাদের সংস্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমন্ত জনপদ, মৃতপ্রায় জাতি সন্ধান পায় আবে হায়াতের, আলোর দিশা পায় আঁধারে নিমজ্জিত বিপন্ন মানবতা। যারা আপন দক্ষতা, সাধনা ও লিল্লাহিয়াতের গুণে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে যান। কালোত্তীর্ণ এমনই এক মহামনীষী মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : এই মহান মনীষীর পূর্বপুরুষগণ আরব বা ইরান থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে তাদের অবস্থান ছিল বলে জানা যায়। গৌড় হতে গফুর খান নামক এক ব্যক্তি মোঘল শাসনামলে চট্টগ্রামের হাওয়াগী বা হালি শহরে এসে উপস্থিত হন। তার অষ্টম অধস্তন বংশধর ছিলেন মুন্সী হেদায়েত আলী চৌধুরী। তারই ঔরসে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩১০ হিজরী সনে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ঐতিহ্যবাহী মেখল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.। তার রত্নগর্ভা মায়ের নাম মুহতারামা রহীমুন্নেসা। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রজ।

শিক্ষাজীবন : মেখলের ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী পরিবারের প্রায় সকলেই ছিলেন জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত। চাচা কুরবান আলীর সব ছেলেরাই উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী। তাদের সবার ইচ্ছা ছিল শিশু ফয়যুল্লাহকেও তাদের ধাঁচে গড়ে তুলবেন। কিন্তু তার পিতা ছিলেন একজন খোদাপ্রেমিক মুখলিস বান্দা। তিনি স্থির করলেন ছেলেকে বড় আলেম বানাবেন। সে অনুযায়ী শুরু হল পথ চলা। নিজ গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ভর্তি হন উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দীনী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায়। তিনি এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রথম যুগের ছাত্র।

শৈশবের খোদাভীতি : তিনি যেন মাতৃগর্ভ থেকেই ওলী হয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। শৈশব থেকেই তার চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র এবং প্রতিটি আচরণে ছিল বুযুর্গীর সুস্পষ্ট ছাপ। হাটহাজারীতে তখন তিনি প্রাথমিক স্তরের ছাত্র। একদিন দরসে উস্তাদ সবক দিলেন, বেগানা নারীদের সামনে যাওয়া হারাম। কিন্তু নিষ্পাপ ফয়যুল্লাহর জানা ছিল না, বেগানা কারা? প্রতিদিন মাদরাসা হতে খানা খেতে বাড়িতে গেলেও সেদিন আর গেলেন না। মমতাময়ী মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। দিনশেষে পিতা বাড়িতে এসে ঘটনা শুনলেন। অনেক খোজাখুঁজির পর দেখা গেল কাচারী ঘরের এক কোণে না খেয়ে বসে আছেন বালক ফয়যুল্লাহ। কারণ জানতে চাওয়া হলে সাফ শুনিয়ে দিলেন সেদিনের পঠিত সবক– মহিলাদের সামনে যাওয়া যাবে না। বাবা কিছুতেই বুঝাতে সক্ষম হলেন না যে, মা-বোন সেই বিধানের আওতায় নয়। নিরুপায় হয়ে পিতা ছেলেকে নিয়ে আসলেন হাটহাজারী মাদরাসায়। ঘটনা শুনে প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা হাবীবুল্লাহ রহ. কিতাব খুলে পুনরায় বোঝানোর পর তিনি ঘরে ফিরলেন। শৈশবের এ ঘটনা মুফতী সাহেব রহ. এর শিশুকাল থেকেই কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি অপরিসীম জযবার প্রমাণ বহন করে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য দেওবন্দ গমন : তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় দীর্ঘ দশ বছর পড়ালেখা করে দাওরায়ে হাদীস সমাপন করেন। অতঃপর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। সেখানে প্রায় আড়াই বছর যাবত বিশ্ববরেণ্য উলামা-মাশাইখের একান্ত সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। যে সকল পরশ পাথরের ছোঁয়ায় তিনি ধন্য হয়েছিলেন তাদের অন্যতম হলেন– ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ., বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস খাতামুল মুহাক্কিকীন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ., ফকীহুল আসর মুফতী আযীযুর রহমান রহ. প্রমুখ।

কর্মজীবন : উচ্চতর শিক্ষা সমাপন করে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার সাথে সাথেই তিনি হাটহাজারী মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাশাপাশি ফাতাওয়া বিভাগের প্রধান মুফতীর পদ তাকে অর্পণ করা হয়। ফিকহ-ফতওয়ায় তার অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পাওয়ায় অল্প সময়ে তার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তিনি গোটা উপমহাদেশে 'মুফতিয়ে আযম' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মেখল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন দুর্দম। এমনই কোন কারণে তিনি হাটাহাজারী মাদরাসা হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং নিজ গ্রামের মানুষের হিদায়াতের কথা চিন্তা করে বাড়ির মসজিদের বারান্দায় শতভাগ আসহাবে সুফ্ফার নমুনায় বিশেষ পদ্ধতিতে পাঠদান আরম্ভ করেন। তার উন্নত চরিত্র-মাধুর্য ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বাড়ে মাদরাসার পরিধিও। তারপর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসাটি 'হামিউস সুন্নাহ মেখল মাদরাসা' নামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য : উলূম ও ফুনূনের অথৈ সমুদ্র মুফতিয়ে আযম রহ. ছাত্রদের ইলমী পরিপক্কতার ক্রমবর্ধমান অবনতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন 'বুনিয়াদী তা'লীমের দুর্বলতা'কে। তিনি অনুভব করেন, প্রাথমিক স্তরে নাহ্ব-সরফের দুর্বলতা এই অবনতির প্রধান কারণ। তাই তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফিক্হ-হাদীসের দরস প্রদান ত্যাগ করে জাতিকে এই ইলমী অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। যে পদ্ধতিতে তিনি প্রতিটি ছাত্রকে ইজরার মাধ্যমে নাহ্ব-সরফে

পারদর্শী করে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার এ নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি 'মেখল তরয' নামে সর্বমহলে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে ছাত্ররা তার সান্নিধ্যে ছুটে আসে। শত শত ছাত্রের সমাগম হওয়ার পর মাদরাসাটিকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত উন্নীত করা শুধুমাত্র ইচ্ছার ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও এই নির্মোহ সাধক সারাটি জীবন জাতীয় স্বার্থে বুনিয়াদী তা'লীম (সর্বোচ্চ শরহেজামী পর্যন্ত) দিয়ে গেছেন। উচ্চশ্রেণির কিতাব পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। হযরতের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজও পর্যন্ত সেখানে মিশকাত-দাওরা জামা'আত খোলা হয়নি। তার এই দূরদর্শী সংস্কার-নীতির সুফল যুগযুগ ধরে বাংলার উলামা সমাজ উপভোগ করছেন।

মেখল মাদরাসার আবাসন ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনো পর্যন্ত সেখানে বোর্ডিং ব্যবস্থা চালু হয়নি। ছাত্রদের নিজ যিম্মায় অথবা জায়গীর ব্যবস্থার মাধ্যমে খানার প্রয়োজন সমাধা হয়ে থাকে। মুফতী সাহেবের প্রতি এলাকাবাসীর সীমাহীন আন্তরিকতার ফলে শত শত ছাত্রের খানার ব্যবস্থা মহল্লার ঘরে ঘরে হয়ে থাকে।

আধ্যাত্ম সাধনা : মুফতিয়ে আযম রহ. এর আধ্যাত্ম সাধনার মূল কেন্দ্র হচ্ছেন তার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা, হাটহাজারী মাদরাসার (তথা বাংলার) প্রথম শাইখুল হাদীস আল্লামা সাঈদ আহমাদ সন্দ্বীপী রহ.। যিনি বড় মুহাদ্দিস নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. এই মহান বুযুর্গের সান্নিধ্যে কঠোর রিয়াযত-মুজাহাদায় লিপ্ত থেকে ইলমে মা'রিফাতের কামালিয়াত অর্জন করেন এবং খিলাফত লাভে ধন্য হন।

বড় মুহাদ্দিস সাহেবের ইন্তিকালের পর দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাটহাজারী মাদরাসার খণ্ডকালীন শাইখুল হাদীস হিসেবে উপমহাদেশের বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও আধ্যাত্মিক সাধক আল্লামা ইবরাহীম বালিয়াবী রহ. কে পাঠানো হয়েছিল। এই মহান বুযুর্গও মুফতিয়ে আযম রহ. কে খিলাফত প্রদান করেন।

ফাতাওয়ার ময়দানে বিদগ্ধ ফকীহ : দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী আযীযুর রহমান রহ. এর নিকটে তিনি ফতওয়া অনুশীলন করে ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরবর্তীতে প্রায় দুই দশক পর্যন্ত হাটহাজারীর প্রধান মুফতীর আসনে সমাসীন ছিলেন। সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের মতে, তিনি শতাব্দীর মুজতাহিদ ছিলেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন : চট্টগ্রাম একদিকে যেমন বাংলাদেশের ইলমী রাজধানী, অপরদিকে এটা বিদ'আত, কুসংস্কার, উরস, মাজার, অধর্ম, অপসংস্কৃতির জন্যও উর্বর ভূমি। মুফতিয়ে আযম রহ. ছাত্র জীবন থেকেই সকল গোমরাহীর বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছেড়েছেন। ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করে জাতিকে সজাগ করেছেন।

সে সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে শেরে বাংলা নামে প্রসিদ্ধ একজন প্রভাবশালী বিদ'আতপন্থী পীর ছিল। তার অনুসারীরা তাকে যুগের মুজতাহিদ মনে করত। শরয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি ছিল তার মূল বৈশিষ্ট্য। ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতকে সে বাধ্যতামূলক করেছিল। কেউ মুনাজাত না করলে তাকে মারধর করা হতো।

একদিন হাটহাজারী মাদরাসার কিছু ছাত্র দরস শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক মসজিদে নামায আদায় করে। ব্যস্ততা থাকায় ছাত্ররা মুনাজাত না করে বেরিয়ে আসলে শেরে বাংলার ভক্তরা তাদেরকে মারধর করে। অথচ মুনাজাত মূল নামাযের অংশ নয়; এটি মুস্তাহাব আমল। এ নিয়ে কাউকে বাধ্য করা বা গালমন্দ করার কোন সুযোগ নেই। কোন অঞ্চলে যদি এটাকে বাধ্যতামূলক মনে না করা হয় তাহলে ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার সময়ে মুনাজাত করতে কোন অসুবিধা নেই। যা এই উম্মতের স্বাভাবিক আমল। শুরুর দিকে মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-ও মুনাজাতের পক্ষে ছিলেন। এমনকি দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ. সম্মিলিত মুনাজাতের পক্ষে একটি ফতওয়া লিখেছিলেন সেখানে মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.-ও স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু এই মুস্তাহাব বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মারধর করার ঘটনা –যা ছিল নিঃসন্দেহে সীমাহীন বাড়াবাড়ি– এটাকে মুফতী আযম রহ. কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি। এরপর থেকে তিনি শেরে বাংলার মতাদর্শের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সম্রাট আকবরের দীনে ইলাহীর যুগে স্বার্থান্বেষী দরবারী আলেমরা বিদ'আতকে হাসানা ও সায়্যিআ দুভাগে ভাগ করে নিজেদের মনগড়া কাজকে বিদ'আতে হাসানা (উত্তম আবিস্কার) বলে সমাজে চালু করে দিত। সে সময় মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, বিদ'আতে হাসানা বলতে কিছু নেই। সকল বিদ'আতই গোমরাহী। সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়ে বিদ'আতের অসারতা বদ্ধমূল করার লক্ষ্যেই কেবল তিনি এতটা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তেমনিভাবে মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. মুনাজাত নিয়ে শেরে বাংলার অহেতুক বাড়াবাড়ি বন্ধ করার মানসে স্থান, কাল ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ফতওয়া প্রদান করলেন– ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত মুনাজাত বিদ'আত। অবস্থা বিবেচনায় তার এই দৃঢ়তা ও কঠোরতা ছিল সময়ের দাবী। তার ফতওয়াটি ছিল সমসাময়িক এবং আঞ্চলিক। কেননা তার সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম এবং পরবর্তী সকল উলামায়ে কেরামের আমল ছিল তার ঐ ফতওয়ার বিপরীত। তার প্রধান খলীফা খতীবে আযম রহ.ও সম্মিলিত মুনাজাত করতেন। এমনকি মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. এর সমসাময়িক পটিয়া মাদরাসার মুহতামিম মুফতী আযীযুল হক রহ. ঐ ফতওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। (তথ্যসূত্র : আল্লামা সুলতান যওক নদবী দা.বা. রচিত তাযকিরাতুল আযীয)

তবে আজও যদি কোথাও কোন 'শেরে বাংলা' মুনাজাত নিয়ে এ ধরনের ধৃষ্টতা দেখায় তাহলে সে ক্ষেত্রেও মুফতী আযম রহ. এর সেই ফতওয়া কার্যকর হবে।

মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. ব্যক্তিগতভাবে শায়ের (কবি) ছিলেন। ফারসী ভাষায় তিনি অনেক শের (কবিতা) রচনা করেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম ওয়ায নসীহতের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের স্থানে শুধু শের পড়ে থাকেন এবং এ অবস্থা দিন দিন উদ্বেগজনক হারে বেড়েই চলেছে তখন এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য তিনি এর বিরোধিতা ও কদর্যতা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। অথচ মুফতী সাহেবের প্রধান খলীফা খতীবে আযম রহ. বয়ানে খুব শের পড়তেন।

মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম মনে করেন, এ ব্যাপারে তার কঠোরতার প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় আজ বহু উলামায়ে কেরামের ওয়ায-নসীহতে কুরআন-হাদীসের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। শুধু পাওয়া যেত শের আর সুরের মূর্ছনা।

সংস্কার নীতিতে ছিলেন ইমাম গাযালী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ভাবশিষ্য : গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত আধ্যাত্মবাদ তথা দর্শন শাস্ত্রের আমূল সংস্কার সাধন করে সঠিক ইসলামী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইমাম গাযালী রহ.। আর হিন্দুয়ানী দর্শন মিশ্রিত বিদ'আত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের সংস্কার করেছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.। এই দুই মহান সংস্কারকের চেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ.। তিনি তার বয়ান ও লেখায় প্রচুর পরিমাণে তাদের উদ্ধৃতি দিতেন।

বিশিষ্ট খলীফা ও শাগরিদবৃন্দ : তিনি ছিলেন মানুষ গড়ার সুদক্ষ কারিগর। এই পরশ-পাথরের সান্নিধ্যে এসে যারা স্বর্ণমানবে রূপান্তরিত হয়ে দীনের বহুমুখী খিদমত আঞ্জাম দেন তাদের অন্যতম হলেন, খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ সাহেব রহ., হাটহাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম সাহেব, ব্যারিস্টার মাওলানা সানাউল্লাহ রহ., মাওলানা আব্দুল আযীয রহ. (মেখল মাদরাসা)। এছাড়াও তার বিশিষ্ট শাগরিদদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখুল হাদীস মাওলানা ইয়াকূব রহ., মাওলানা শাহ আব্দুল জলীল রহ., মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. মুফতী ইউসুফ ইসলামাবাদী রহ., মুফতী আহমাদুল হক রহ., আল্লাহ শাহ আহমাদ শফী দা.বা. প্রমুখ।

রচনাবলী : ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে কলমী জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি তার ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ সরলভাবে জাতির সামনে পেশ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেক ছুটিতে তিনি একটি করে পুস্তিকা লিখতেন। উর্দূ, ফারসী, আরবী ইত্যাদি ভাষায় রচিত তার পুস্তকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফয়যুল কালাম, হিদায়াতুল ইবাদ, ইযহারুল মুনকারাত, তাওযীহুল বয়ান, তা'লীমুল মুবতাদী, শরহে বোস্তাঁ, শরহে গুলিস্তাঁ, কারীমা, হিফযুল ঈমান ইত্যাদি।

সুন্নাতের অনুসরণ বড় কারামত : তিনি ছিলেন সুন্নাতে নববীর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আহলুল্লাহদের থেকে জাহেরী কোন কারামত প্রকাশ পাওয়া জরুরী নয় এবং তা ফযীলতেরও বিষয় নয়। শরীয়ত ও সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণই হল বুযুর্গীর আলামত। বিভিন্ন সময় তার থেকেও বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় কারামত ছিল সুন্নাতের পূর্ণ অনুকরণ এবং অবিচলতা। গোটা জীবনে তার থেকে খিলাফে সুন্নাত কোন কাজ প্রকাশ পেতে দেখা যায়নি।

উস্তাদের মুখে মাকবূলিয়াতের স্বীকৃতি : সুন্নাত ও শরীয়তের এই পাবন্দীর কারণেই তিনি মুরব্বীদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। একবার তার উস্তাদ হাটহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ রহ. মন্তব্য করেছিলেন, আমাকে যদি হাশরের ময়দানে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কী নিয়ে উপস্থিত হয়েছো? আমি গর্বভরে বলব, পরওয়ারদেগার! আমি মুফতী ফয়যুল্লাহকে নিয়ে তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।

ইন্তিকাল : তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর মোতাবেক ১৩৯৬ হিজরীর ১২ই শাওয়াল দুপুর বেলা নিজ গৃহে 'আল্লাহ আল্লাহ' উচ্চারণ করতে করতে সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে রফীকে আ'লার সান্নিধ্যে গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)

ইন্তিকালের সময় তিনি এক পুত্র এবং দুই কন্যাসহ অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী রেখে যান। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ আসনে সমাসীন করুন। আমীন। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই মাহবূব বান্দার সাথে জান্নাতী মুআমালাই করেছেন। যার কিছুটা আভাস দুনিয়াবাসীর সামনেও প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় খতমে বুখারীর মাহফিল চলছিল। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছে দরসে বুখারীতে শরীক হওয়ার জন্য। উপস্থিত সকলে অবচেতনভাবে অনুভব করছিল এক অকল্পনীয় সুঘ্রাণ। কিন্তু আশ্চর্য! এমন সুঘ্রাণ তো তারা জীবনে কল্পনাও করেনি। কৌতুহলী মানুষ বেরিয়ে পড়ল উৎসমূলের তালাশে। শেষে দেখা গেল এ জান্নাতী সুঘ্রাণ মুফতিয়ে আযম রহ. এর কবর থেকে বেরিয়ে আসছে। যা প্রায় আধা কি.মি. দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চারিদিক থেকে মানুষের ঢল শুরু হল কবর মুখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হিমশিম খেয়ে যায়। টানা ১৮দিন পর্যন্ত তার কবর থেকে এই খুশবু উৎসারিত হতে থাকে। মানুষ কবরের মাটি সংগ্রহে উদ্যত হলে রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার রূহানী ফয়য দ্বারা আমাদেরকেও সিক্ত করুন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা শফীকুর রহমান কাশিয়ানী
মুঈনে দারুল ইফতা, জামি'আ রাহমানিয়া
আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

(৪নং পৃষ্ঠার পর; আহলে হাদীসের...)

ঈমানের কথা বলে ও শোনে। তারা আল্লাহর মেহমান। তারা কার ঘরে থাকবে? আপনার মেহমান কার ঘরে থাকে? আপনার ঘরে না অন্য কারো ঘরে? আপনার ঘরে থাকে। তো তাবলীগওয়ালারাও আল্লাহর মেহমান; তারা তো আল্লাহর ঘরেই থাকবে।

তাহলে তাদের কোন কাজটি ইসলাম বিরোধী? আমি তো কোনোটা ইসলাম বিরোধী দেখছি না। তারা যে মসজিদে ঘুমায় সেটাও শরীয়তসম্মত, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন : সীরাতে মুস্তাকীম অর্থ সোজাপথ। সোজাপথ কি ৪টা হয়, না ১টা হয়?

উত্তর : তারা এই মহা ভুল ধারনায় আছে যে, চার মাযহাব মানে চার ধরনের আকীদা বিশ্বাস। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। চার মাযহাবে আকীদা-বিশ্বাস এক। তাই চারো মাযহাব সীরাতে মুস্তাকীমের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। মাযহাবের এই ভিন্নতা কেবল শাখাগত কিছু মাসআলা কেন্দ্রিক এবং দলীল ভিত্তিক। যে ভিন্নতার বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীকৃত। যেমন, নামাযে হাত নাভীর নিচে বাঁধা হবে, না নাভীর উপরে; আমীন নিচুস্বরে হবে, না উচ্চস্বরে হবে, মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়বে কি পড়বে না, রাফয়ে ইয়াদাইন করবে কি করবে না ইত্যাদি।

তাহলে ঈমান-আকীদা যেহেতু চারও মাযহাবেই এক এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। কাজেই চারটিই সোজাপথ, চারটিই একপথ সীরাতে মুস্তাকীম।

পরিচিতি : শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
বিশিষ্ট খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ
আবরারুল হক রহ.

আলোকময় কুরআন

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.

আজ জুমু'আর দিন। এ দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াতের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এটা পনের পারায় শুরু হয়ে ষোল পারায় শেষ হয়েছে। এ সূরার প্রথম আয়াত হলো,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তার দাসের উপরে নাযিল করেছেন এই কিতাব এবং এর মধ্যে কোন জটিলতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ-১)

প্রশ্ন হতে পারে, কোন জটিলতা না থাকলে কুরআনের এত ব্যাখ্যা কেন? যেমন, সূরা নূরের এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থ : আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পুতঃপবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা নূর-৩৫)

এটা এত কঠিন আয়াত যে, যুগ যুগ ধরে সমস্ত মুফাসসিরে কুরআন এই আয়াতের উপরে অনেক গবেষণা করেও নিশ্চিত সমাধানে পৌঁছতে পারেননি। এমনকি আজ থেকে এক হাজার বছর আগে ইমাম গাযালী রহ. এই আয়াতের উপর বিরাট তাফসীর গ্রন্থ লিখেছেন।

সুতরাং কুরআনে জটিলতা না থাকার কথাটি পুরোপুরি মিললো না। এ আপত্তির উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, হ্যাঁ, এ ধরনের আয়াতের গভীরতায় পৌঁছানোর জন্য অনেক গভীর ইলম প্রয়োজন। কিন্তু সব আয়াত এমন নয়। যেসব আয়াতে দৈনন্দিন সাধারণ বিধি-বিধান আছে, সেগুলো যে কোন মানুষ বুঝতে পারে। এভাবে যে আয়াতগুলো বোঝা আমাদের প্রয়োজন, সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা অকল্পনীয় সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় প্রয়োজনীয় কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামাই। যেমন, উল্লিখিত সূরা নূরের আয়াতটিতে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী নেই। এ আয়াতটির সুনিশ্চিত মর্ম বোঝা সহজ নয়। পৃথিবীর সব উলামায়ে কেরাম মিলে যদি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গবেষণা করেন তবু নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছতে পারবেন না। এমন আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ হলো, এগুলো তিলাওয়াত করো; সওয়াব পাবে। আর বিশ্বাস রাখো, এ আয়াতে আল্লাহ যা বলেছেন, সত্য বলেছেন; যদিও আমরা তা বুঝতে পারি না। এটাই আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا.

অর্থ : মহা বরকতময় সেই সত্তা যিনি আকাশে বুরুজ (Steller Formation) বানিয়েছেন এবং তাতে সূর্যকে বানিয়েছেন প্রদীপ ও চাঁদকে বানিয়েছেন নূর। (সূরা ফুরকান-৬১)

এখানে কুরআন বলছে, He has made the moon a light and made the sun a lamp। এই আয়াতে চিন্তা করার অনেক সুযোগ আছে। ইংরেজি শিক্ষিত– যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা করেন– তাদের জন্য চিন্তার উপকরণ আছে।

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন মাজীদ চাঁদের জন্য কী শব্দ ব্যবহার করেছে, আর সূর্যের জন্য কোন শব্দ এটা চিন্তা করার বিষয়। সে সময় মানুষ জানতো না, চাঁদের যে হালকা আলোয় দুনিয়া আলোকিত হয়, সেটা চাঁদের নিজস্ব আলো নয়; বরং সূর্যের আলোর প্রতিফলন। তখনো এটা আবিষ্কার হয়নি। অথচ কুরআন তখনকার দিনের মানুষের জন্য সহজ ও মানানসই শব্দ ব্যবহার করেছে। এটা গবেষণার বিষয়। কিন্তু কেউ যদি এই গবেষণা শুরু করে যে, আল্লাহ চাঁদকে নূর বললেন, আবার আল্লাহ নিজেকেও নূর বলেছেন, তাহলে এই গবেষণা অনর্থক। এমন গবেষণার কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। সূরা বাকারায় আয়াতুল কুরসীর এক আয়াত পরে আছে,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে নূরের দিকে। (সূরা বাকারা-২৫৭)

এই আয়াতে 'নূর' অর্থ হিদায়াত বা কুরআন অথবা রাসূলের তরীকা। কাজেই 'নূর' শব্দের অনেক অর্থ আছে। আমাদের কর্তব্য হল, সহজ-সরল বিষয়গুলো মানা। আর যে বিষয়গুলো কঠিন বলা হয়েছে সেগুলোতে মাথা না ঘামানো। কুরআনের কঠিন বিষয়ে মাথা ঘামানো বোকামী এবং সময়ের অপচয়। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বার বার বলতেন, কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত বড় দামী জিনিস। হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ব্যাপারে প্রায়ই বলতেন যে, মসজিদে যাওয়ার পর যদি দেখা যায় নামাযের এখনো এক মিনিট সময় বাকী আছে, তবু একটি কুরআন শরীফ নিয়ে তিলাওয়াত করা উচিত। এক মিনিট যেতে না যেতেও যদি মুয়াযযিন সাহেব ইকামত দেয়া শুরু করেন তবু কিছু আসে যায় না। কারণ এই এক মিনিটেই যদি কমপক্ষে এক লাইনও পড়া হয় তাহলে এক লাইনে পঁয়ত্রিশটি হরফ ধরে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী হিসেবে তিনশ পঞ্চাশ নেকী হবে। আখিরাতে একটি নেকীর জন্য মানুষ আফসোস করবে। তাই দুনিয়ায় একটি নেকী অর্জন আসলে মস্ত বড় উপার্জন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, 'নেকী কী এখন বোঝ না। নেকী হল কবরের পরের জীবনের ফরেন কারেন্সি।' মক্কা শরীফে বাংলাদেশের টাকা চলে না। (অবশ্য আজকাল কিছু চলে। একশ টাকার নোট, পাঁচশ টাকার নোট এখন মক্কা শরীফে গ্রহণ করে।) আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যদি পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে আপনি কিছু কিনতে যান, সবাই আপনাকে বোকা বলবে। সেখানে ডলার লাগবে। তেমনি কবরের জীবনে সোনা-রূপা, পয়সা-কড়ি কিছুই কাজে আসবে না। সেখানে কাজে আসবে নেকী। অথচ এই নেকী অর্জনেই আমরা গাফেল।

নেকী কামাইয়ের সহজ সহজ সুযোগকে আমরা অনর্থক আলোচনায় নষ্ট করি। আমরা গবেষণা করি, মি'রাজের সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম আসমানে হযরত আদম আ.কে কেন পেলেন? আদম আ. এর মর্যাদা কি তাহলে কম? বেকার, একদম বেহুদা চিন্তা-ভাবনা। বলে যে, আমি বহুদিন ধরে খুব চিন্তা করছি, ব্যাপারটা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম আসমানে আদম আ. কে পেলেন কেন? তারপর আরেক আকাশে গিয়ে অমুককে পেলেন কেন? এসব তত্ত্ব-তালাশ, চিন্তা-গবেষণা একেবারে অনর্থক, বেকার। এগুলোতে কোন ফায়দা নেই। বরং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে যে বিষয়গুলো উপকারী সেগুলোতে সময় দেয়া উচিত। সহজ কাজ হলো, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, মাসআলা-মাসাইল শেখা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহজ সুন্নাতগুলো আঁকড়ে ধরা। এ ধরনের নেকীর কাজে বেশি বেশি সময় দেয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতে বলেছেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.

অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (সূরা কাহাফ-১)

ভূমিকাটি কী অদ্ভুত! আল্লাহ তা'আলা নিজের কথার মধ্যে নিজেই ভূমিকা দিচ্ছেন। ভূমিকা কী? আলহামদুলিল্লাহ! বলুন, আলহামদুলিল্লাহ। কী অদ্ভুত পদ্ধতি বলার! আগে নিজে আলহামদুলিল্লাহ বলাচ্ছেন বান্দাকে দিয়ে। বল, আলহামদুলিল্লাহ। যে মহান আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন তার বান্দার উপরে যার মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই। প্যাঁচ না থাকার কথাটি এভাবে বুঝতে হবে যে, যে কথা সাধারণ দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে তা অতি সহজ করে বলা হয়েছে।

এ ধরনের আরো একটি আয়াত আছে সূরা কমারে। আয়াতটি আল্লাহ তাআলা এই সূরায় চারবার বলেছেন। আয়াতটি হল,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অর্থ : আমি এ কুরআনকে বড় সহজ করে দিয়েছি যিকিরের জন্য। (সূরা কমার-১৭)

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, যিকিরের অর্থ দু'টি। একটি হল মুখস্থ করা। অর্থাৎ মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আরেকটা হল, নসীহত গ্রহণ করা। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের অতি সহজ-সরল নসীহত, যা যে কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ মুখস্থ করার জন্য ও নসীহত গ্রহণ করার জন্য আমি কুরআনকে বড় সহজ করে দিয়েছি। তারপর বলেন, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (অর্থ) 'কোন চিন্তাশীল আছে কি?' আছে কেউ এটা মুখস্থ করবে? আছে কেউ এখান থেকে নসীহত গ্রহণ করবে?

আপনি চিন্তা করেন, বলার পদ্ধতিটা কী রকম! 'আমি কুরআনকে বড় সহজ করে দিয়েছি মুখস্থ করার জন্য, নসীহত গ্রহণের জন্য।' এ পর্যন্ত বললে তো বাঁচতে পারতাম। তারপরে বলেন, 'আছে কেউ এটি মুখস্থ করবে? আছে কেউ এখান থেকে নসীহত নেবে?' যেন আল্লাহ তা'আলা ভিখারীর মত আমাদের দুয়ারে দুয়ারে রাতের বেলায় দিনের বেলায় বলছেন যে, হে বান্দা তোমাকে বানিয়েছি আমি। মায়ের পেটে অন্ধকারে বানিয়েছি আমি। একটা ফোঁটা থেকে বানিয়েছি আমি। তোমার টলটলে চোখ দুটো দিয়েছি আমি। তোমার ঐ সুন্দর চেহারা দিয়েছি আমি। বান্দা! তোমার একটু সময় হবে, আমার কালামে মাজীদ শুদ্ধ করে পড়বে, শিখবে? আমরা জবাব দিই, আমার সময় নেই। বাস্তবে আমাদের আমল কি এ রকম নয়? কুরআন মাজীদের এই সূরার মধ্যে চার-চারবার আল্লাহ এই কথাটি বললেন,

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অর্থাৎ আছে কেউ, সময় হবে আমার কালামকে একটু দেখার? একটু বোঝার? একটু পড়ার? একটু শেখার? আমাদের জবাব কী হয়? আমার সময় নেই। আমার এখন ইস্টার্ন রিফাইনারীতে ডিউটি আছে। বলা হয়, আচ্ছা তাহলে আপনার বাচ্চাটিকে একটু মসজিদে পাঠাবেন? কুরআন শরীফ পড়াব। বলে, এখন পরীক্ষার পর ক্যাডেটে ভর্তির জন্য কোচিং-এ ক্লাস করে; সময় নেই। বাপেরও সময় নেই, ছেলেরও সময় নেই। অথচ সময় দিয়েছেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ.

অর্থ : মানুষ কি দেখে না যে, নিশ্চয়ই আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টিকে ভুলে যায়। সে তার নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যায়। (সূরা ইয়াসীন-৭৭-৭৮)

সে বরং উল্টো আমার সঙ্গে ঝগড়া করে,

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.

অর্থ : কে আবার এই মরা হাড়গুলোকে জীবিত করবে? (সূরা ইয়াসীন-৭৮)

আল্লাহর শব্দ অপূর্ব মিষ্টি! মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি একটা ফোঁটা থেকে বানিয়েছি। সে আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে। আর আমার কথা বলে, কে নাকি পয়দা করবে? সে ভুলে যায় তার সৃষ্টিকে। কী মিষ্টি শব্দ! এরূপ আপনি আমিও বলি। একটা এতিম ছেলেকে আপনি লালন-পালন করেছেন। আপনার বাড়িতে রেখে খাইয়েছেন, পরিয়েছেন। তাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। ডিগ্রি পাস করিয়েছেন। এম এ পাস করিয়েছেন। এখন সে আপনাকে চেনে না। আপনি কী বলবেন? নিজেকে নিজে বলবেন, তার জন্য এতো এতো করলাম! আর সে কিনা....। তো বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ পাক আমাদের মতো করেই কথা বলছেন! আমার বান্দা আমাকে আজকে চেনে না। আমার সম্পর্কে এ রকম কথা বলছে! তাকে কীভাবে বানিয়েছিলাম, সে ভুলে যায়। সূরা কাহাফের মধ্যে আছে,

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

অর্থ : তুমি কি সেই মহান রবকে অবিশ্বাস করলে, যিনি মাটি থেকে বানিয়েছেন তোমাকে, একটা ফোঁটা থেকে বানিয়েছেন তোমাকে, কী অপূর্ব সুন্দর আকৃতিতে তোমাকে একটা মানুষ বানিয়েছেন তিনি। (সূরা কাহাফ-৩৭)

তিনটি কথা আল্লাহ একই সঙ্গে বলেছেন। মাটি থেকে বানিয়েছেন তোমাকে, একটা ফোঁটা থেকে বানিয়েছেন তোমাকে এবং পরিপূর্ণভাবে তোমাকে একটা মানুষের আকৃতি দিয়েছেন। তাঁকে তুমি অবিশ্বাস কর? আমরা খুব সহজেই বলব, আমরা কোনদিন আল্লাহকে অবিশ্বাস করি না। আমরা সবাই আল্লাহকে মানি। কত আমল করি, কত যিকির করি! কুরআনের এই দাবী, أَكَفَرْتَ بِالَّذِي (অর্থ) 'তুমি কি অবিশ্বাস কর?' এই আয়াতের ব্যাপারে আমরা সবাই পাস করব। কিন্তু যখন ঐ সূরা কমারের আয়াত আসবে, আল্লাহ পাক যেখানে বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অর্থ : আমি এই কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য, মুখস্থ করার জন্য,

আছে কেউ একটু সময় দিবে? (সূরা কুমার-১৭)
কী জবাব দেব আমরা? আমি আজকে যে আয়াতটা তিলাওয়াত করেছি সেখানেও একই রকম। আল্লাহ তা'আলা আবারো ভূমিকা করেন,
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.
অর্থ : বরকতময় সেই মহান সত্তা, যিনি নাযিল করেছেন তার দাসের উপরে ফুরকান (এখানে কুরআনের নাম দিয়েছেন ফুরকান। ফুরকান অর্থ যা দিয়ে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করা যায়), যাতে সে হয় সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী। (সূরা ফুরকান-১)
আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন,
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.
অর্থ : হে কাপড় আবৃত ব্যক্তি! উঠুন, দাঁড়ান, মানুষকে সতর্ক করুন। আপনার রবের বড়াই বর্ণনা করুন। (সূরা মুদ্দাসসির-১-৩)
কাব্বির অর্থ হল, আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর। কাব্বির শব্দের আমলী জবাব হল, আল্লাহু আকবার।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, মানুষকে নসীহত কর। মনে করিয়ে দাও, এমন একটা দিন আসবে যেদিন কিছুই কাজে আসবে না। সেদিনের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সূরা বাকারায় আয়াতুল কুরসীর ঠিক আগের আয়াত,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
অর্থ : ঐদিন আসার আগে খরচ কর (কোথায় খরচ করতে হবে এটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ), যেদিন কোন কেনা-বেচা কাজে আসবে না। কোন আত্মীয়তা কাজে আসবে না। কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। অবিশ্বাসীরাই জালেম। (সূরা বাকারা-২৫৪)
জুমু'আ নামায সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আছে,
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.
অর্থ : দৌড়াও যিকিরের দিকে, নামাযের দিকে। কেনা-বেচা ছেড়ে দাও। (সূরা জুমু'আ-৯)
জুমু'আর দিনে আযানের পরে কেনা-বেচা হারাম। আপনি এখন চিন্তা করুন, আমাদের অনেক ভাই জুমু'আর নামাযের আযানের পরে দোকান খোলা রাখে কিনা? অথচ কুরআনের ভাষায় হারাম। আমাদের উচিত তাদের দাওয়াত দেয়া, ভাই! জুমু'আর আযানের পরে কেনা-বেচা করো না; এটা হারাম। একথা আমাদেরই বলতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ আমাদেরই কাজ। ঐ যে সূরা ইউসুফের আয়াত আপনাদের শুনালাম,
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي.
অর্থ : আপনি বলুন, এটি আমার কাজ আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি এবং যে কেউ আমাকে অনুসরণ করে। (সূরা ইউসুফ-১০৮)
তার মধ্যে আমি-আপনারা সবাই শামিল। যেকোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করল, তার একটা কর্তব্য হল আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া। আর আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাখ্যা হল, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো শরীয়ত, প্রতিটি হুকুম যেগুলো আমাদের জন্য সহজ-সরলভাবে প্রযোজ্য সেগুলো অন্যকে বলতে হবে। আমি শুধু আমল করলাম, কাউকে কিছু বললাম না- এটা ভদ্রলোকের কাজ? না, ভদ্রলোক কাউকে কিছু বলে না, এটা ভুল।
কাজেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সজাগ হবার সৌভাগ্য দিন। আমাদের দায়িত্বকে বুঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনকে যিন্দা করার জন্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। আমার আমল নেই, এজন্য কাউকে কিছু বলব না, এটা ভুল। আমাকে দাওয়াত দিতে হবে। হতে পারে, যাকে দাওয়াত দিলাম তিনি আমলে আগে বেড়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ তার সওয়াব আমার কপালে জুটবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উত্তম বুঝ নসীব করুন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার সৌভাগ্য দিন। তার সুন্নাতগুলোকে যিন্দা করার লক্ষ্যে মেহনত করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আ-মীন।

সংগ্রহ : মাওলানা মাহমূদুল আমীন
মুদীর, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বছিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

বড়দের লেখা

শরীয়তে পীর মুরিদীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আল্লামা কাযী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ.

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতী দায়িত্ব বর্ণনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান, কুরআন মাজীদের (অর্থ, ভাবার্থের) শিক্ষাদান করেন, (নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনে হিকমাত বা প্রজ্ঞার দ্বারা তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে, সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সেই) হিকমাহ,-এর তা'লীম দান করেন (পরিভাষায় যাকে সুন্নাহ বা হাদীস নামে অভিহিত করা হয়) এবং (আল্লাহ প্রদত্ত রূহানী শক্তির মাধ্যমে) তিনি তাদের তাযকিয়া বা মানব প্রকৃতিতে বিরাজিত কলুষ-কালিমা ধুয়ে মুছে পাক-সাফ, পূত-পবিত্র করে দেন।

উলূমে নবুওয়াত বা ওহীর ইলম হল প্রকৃত ইলম বা জ্ঞান। এ ইলমের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিচয় লাভে সামর্থ হয়। সে তার স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে কামিয়াবী অর্জন করে। তার মা'বূদ বা ইলাহের সঠিক ইবাদত বন্দেগী করে সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। ফলে মানুষের মাঝে আখলাকে হাসানা বা অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের বিকাশ ঘটে। মানবীয় সদগুণরাজির উন্মেষ সাধিত হতে থাকে। সে তখন প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়, আশরাফুল মাখলূকাত তথা খলীফাতুল্লাহর মহান আসনে সমাসীন হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি-রহস্য আমাদের বোধগম্যের ঊর্ধ্বে; সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে তিনি পরস্পর বিরোধী, দ্বন্দ্বমুখর দু'টি স্বভাবের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন; মানুষের জড় দেহের চাহিদায় তার স্বভাবের মাঝে কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার-অহমিকা ইত্যাদি পশু-প্রবৃত্তি নিহিত রয়েছে। আবার এই মানব দেহের মাঝে আলমে আমর বা নূরের জগত হতে রূহে ইনসানী বা মানবাত্মার পরম সম্পদ আমানতস্বরূপ দান করা হয়েছে। এই মানবাত্মাই তার হৃদয় জগতকে আলোকিত করে। এই মানবাত্মা বা পরমাত্মার চাহিদায় তার স্বভাবের মাঝে তাকওয়া-পরহেযগারী, সততা-সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, প্রেম-ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ, দয়া-মায়া ইত্যাদি সদগুণরাজির স্ফুরণ ঘটতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বলতে এই মানবাত্মাকেই বুঝায়। কারণ, এই আত্মার কারণে মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল ও সক্রিয়। আত্মার অভাবে সব কিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পঁচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। গোটা দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আর কোন মূল্য থাকে না।

জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান সেই, যে আত্মার চাহিদায় দেহের প্রতি যত্নবান হয়। আত্মাকে উপেক্ষা করে জড় দেহের চাহিদা পূরণে মত্ত মানুষ পশু; বরং পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও হিংস্র জীবে পরিণত হয়। কুরআনুল কারীমে ও হাদীসে নববীতে এ সম্পর্কে মানুষকে বহুভাবে সজাগ-সতর্ক করা হয়েছে।

মানুষের জড় দেহের যেমন খোরাকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, তেমনি মানবাত্মার খোরাকের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। জড় দেহের খোরাক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জন্মের পূর্বেই পৃথিবী বক্ষে বরং জলে-স্থলে সর্বত্র প্রয়োজনানুপাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। মানুষের স্বভাবের মাঝে সে সবের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন এবং বস্তু নিচয়কে মানুষের এই প্রয়োজন মিটানোর বাধ্যতামূলক নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন। মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে এসব কিছুকেই নিত্য নতুনভাবে ভোগ করছে। কিন্তু মানবাত্মা যেহেতু এই বস্তুজগতের ঊর্ধ্বের বহু ঊর্ধ্বের অমূল্য সম্পদ, অতুলনীয়-অনির্বচনীয় অনুপম সৌন্দর্যের আধার এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি, যার খোরাক ও পরিপুষ্টির জ্ঞান, পথ ও পন্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অফুরন্ত রহমত ও দয়ায় মানুষের মাঝ হতে কিছু সংখ্যক মহান পুরুষকে বেছে নিয়ে তাদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। এই মহান পুরুষগণ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত মা'সূম বা নিষ্পাপ বান্দা হাযারাত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। মানুষের উচিত ঐ সব মহামনীষীদের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে মহাদান মনে করে বিনম্রভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে করপুটে গ্রহণ করা। হাযারাত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সেভাবেই সব কিছু ত্যাগ করে এই জ্ঞানালোকে নিজেদেরকে আলোকিত করার পথ বেছে নিয়েছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সাহচর্য ও তাযকিয়ার ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে এত উচ্চ মার্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, একমাত্র মা'সূম আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. ছাড়া আর কোন মানুষ আধ্যাত্মিকতার এত উচ্চস্তরে পৌঁছতে সামর্থ হয়নি।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সকল সদগুণের আধার ও উৎসস্থল, কাজেই যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার যত নৈকট্য লাভ করবে তার মাঝে তত বেশি সদগুণরাজির স্ফুরণ ঘটতে থাকবে। মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হাযারাত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যুগে কোন ভূখণ্ডে কোন সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ মহৎ চরিত্রের অধিকারী একটি আদম সন্তানের আবির্ভাব ঘটেনি, আর ঘটবেও না। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে তাদের এ অনুপম চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করে তাদের উপর নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশের ঘোষণা প্রদান করেছেন। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

অর্থ : (এরা) সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় হতে গাফিল করে না। তারা তো সে দিনের ভয় করে, যে দিন মানুষের অন্তর-চক্ষু বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা নূর-৩৭)

আল্লাহ তা'আলার যিকির হল মানবাত্মার খোরাক। সর্বাপেক্ষা বড় যিকির হল নামায। এ নামায খুশু-খুযু তথা একাগ্রতার সাথে তন্ময়ভাবে আদায় করতে সক্ষম হলে নামায সমাপনান্তে জাগতিক কাজ-কর্মে, যুদ্ধের ময়দানে, দাঁড়িয়ে, বসে, শয়নাবস্থায়ও যিকরুল্লাহ হতে গাফিল হবে না। সাহাবায়ে কেরাম

রাযি. এর অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

পরবর্তীতে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ হতে মানুষ যত দূরে সরে যেতে থাকে, তত বেশি তাদের মাঝে যিকরুল্লাহর শক্তির অভাব ঘটতে থাকে। খাইরুল কুরূনের যুগেই অর্থাৎ আইম্মায়ে তাবেয়ীগণ এ অধঃমুখী গতিরোধে সার্বক্ষণিক যিকরুল্লাহ জারী রাখার উদ্দেশ্যে যে ইজতিহাদী পন্থা আবিষ্কার করেন, তাই হল সুলূক ও তরীকত।

রোগাক্রান্ত হলে বুদ্ধিমান রোগী নিজে নিজে ওষুধ ব্যবহার ও পথ্যাপথ্যের বাছ-বিচার করে হয়ত আরোগ্য লাভ করতে পারে; কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অভাবে নিরাময়ের পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধির প্রবল আশঙ্কা থেকে যায়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ পন্থা গ্রহণ প্রাণনাশের আশঙ্কায় পরিণত হয়। তাই আমরা রোগাক্রান্ত হলে অভিজ্ঞ, সৎচিকিৎসকের শরণাপন্ন হই এবং এটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পৃথিবীতে মানুষ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ উস্তাদের কাছে হাতে-কলমে শিক্ষালাভের মুখাপেক্ষী হয়। সর্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য সত্য।

রূহে ইনসানী বা মানবাত্মা, যার সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ জড় জগতের উর্ধ্বে বহু উর্ধ্বের এক দুর্জ্ঞেয় মহামূল্য সম্পদ। সেই রূহে ইনসানী মানুষের প্রবৃত্তির দাসত্বের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তার চিকিৎসা কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে পড়ে। দেশের পর দেশ জয় করা, গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করা, ছন্দের পর নব নব ছন্দে কাব্য রচনা, দার্শনিক যুক্তি-তর্কের অবতারণা খুবই সহজ। কিন্তু মানব মনের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়, প্রবৃত্তির উদ্দাম গতির মুখে লাগাম দিয়ে রোধ করা বড় দুঃসাধ্য। সুললিত কণ্ঠে ওয়ায করা, নীতি-বাক্যের ফুলঝুরি সাজানো সহজ, কিন্তু মনকে বশে আনা কঠিন ও দুষ্কর কার্য।

মানবাত্মা যদি কোন কারণে উপরে বর্ণিত রোগসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে তার নিরাময়ের পথ ও পন্থা কি? হাদীসে নববীতে বর্ণিত হয়েছে,

لكل شئ صقلة وصقلة القلوب ذكر الله.

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুর জং ও মরিচা দূর করার উপায় বা পদ্ধতি আছে, অন্তরে (গুনাহের কারণে প্রবৃত্তির দাসত্বের ফলে) যে মরিচা পড়ে তা দূরীকরণের রেঁদা হল আল্লাহ তা'আলার যিকির। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

অর্থ : অবাধ্য-অশান্ত মানব মনে আল্লাহর যিকিরই প্রশান্তি আনয়নে সক্ষম। (সূরা র'দ-২৮)

বস্তুর যেমন গুণাগুণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে সক্ষম, আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনা বা গুণবাচক নামসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তদপেক্ষা সহস্র কোটি গুণ বেশি, কিন্তু প্রবৃত্তির দাস আমরা তা অনুভব করতে অক্ষম। অথচ আমার রোগাক্রান্ত হৃদয়ের একমাত্র ওষুধ হচ্ছে এই আসমায়ে হুসনার যিকির, আল্লাহ তা'আলার সানা-সিফাত বা প্রশংসা-স্তুতির যিকির। তাই দৈহিক রোগে ওষুধ ব্যবহারে যেমন আমরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই, তেমনি আত্মার রোগের নিরাময়ে, সুস্থতা আনয়নে আমাকে এ বিষয়ে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সৎচিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। নিজের সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছুই সেই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। উপরে উল্লেখ করেছি যে, মানবাত্মার এই রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যই আইম্মায়ে তাবেয়ীগণ কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর আলোকে যিকরুল্লাহর বিভিন্ন পথ ও পন্থা আবিষ্কার করেছেন। যিকরুল্লাহ হচ্ছে কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর অনুসৃত পথের একমাত্র ওষুধ। অন্য আর কোন ওষুধ নেই। রোগীর ও রোগের স্বভাব-প্রকৃতি ভেদে ব্যবহার-বিধিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এসেছে মাত্র। কিন্তু ওষুধে কোন তারতম্য হয়নি।

মানবাত্মার এসব চিকিৎসকগণ হাযারাত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। যেমনভাবে হাযারাত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাযকিয়ার মাধ্যমে সকল আবিলতা ও কলুষতা হতে পূত-পবিত্র হয়ে গিয়েছিলেন, এসব আইম্মায়ে তাবেয়ীনও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনায় নিজেদেরকে পাক-সাফ করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য ও অতুলনীয় রূহানী শক্তির কারণে তাঁর এক নেকদৃষ্টি লাভে ও স্বল্পক্ষণের সাহচর্যে এসে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চস্তরে আরোহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, পরবর্তী তাবেয়ীগণ সেই অতুলনীয় রূহানী শক্তির সৌভাগ্য পরশ হতে বঞ্চিত হবার ফলে তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে আরোহণ করতে অধিক সময় শ্রম সাধনা-সংগ্রাম করতে হয়েছে। অপর দিকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অধিকাংশকে যে প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলায় ঈমান আনয়ন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে, পরবর্তীগণ সেরূপ প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হননি। অনুরূপভাবে দীনে ইসলামের জন্য তারা যে ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন, জিহাদ ও সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছেন, পরবর্তীদের বেলায় তা অনেক সহজ ও সহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন; হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা প্রশংসনীয়ভাবে সে বাইয়াতের উল্লেখ করে নিজের সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রদান করেন। ইসলামের ইতিহাসে তাই একে 'বাই'আতুর রিযওয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা ফাতহ- ১০, ১৮) সূরা মুমতাহিনার ১০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমা হতে মদীনা তাইয়িবায় আগমনকারিণী মুসলিম রমণীগণকে বাইয়াত করে নেয়ার আদেশ প্রদান করেছেন। সহীহ বুখারীর ঈমান অধ্যায়ে হিজরতের পূর্বে মদীনার খাযরাজ ও আউস গোত্র থেকে বাইয়াত গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে এবং উক্ত হাদীসে ও সূরা মুমতাহিনার আয়াতে যেসব শব্দে বাইয়াত গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে, মাশাইখে কেরাম রহ. সেসব শব্দেই মুরিদগণ হতে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। সহীহ বুখারীর ঈমান অধ্যায়ে হযরত জারীর ইবন আব্দুল্লাহ বাজালী রাযি. হতে বাইয়াত গ্রহণের কথা স্বয়ং হযরত জারীর রাযি. বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের পরের দিন হাজার হাজার লোক হতে বাই'আত গ্রহণের উল্লেখ হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর ঈমান অধ্যায়ে হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বর্ণিত বাই'আতে আকাবার হাদীসের بايعوني (তোমরা আমার নিকট বাই'আত কর) শব্দের ব্যাখ্যায় গাইরে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান

ভূপালী রহ. তার ভাষ্যগ্রন্থ আউনুল বারীতে দলীল-প্রমাণসহ মাশাইখে কেরামের বাই'আত গ্রহণকে সুন্নাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. তার আলআবওয়াব ওয়াত্তারাজিম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩নং পৃষ্ঠায় নওয়াব সাহেবের বক্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। কাজেই কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর অর্থ ও মর্ম হতে অজ্ঞ সালাফী নামের চুনোপুটিদের বাইয়াত করাকে বিদ'আত বলে অভিহিত করা হাস্যস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়; বরং কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববী হতে প্রমাণিত সুন্নাতে মুতাহ্হারাকে বিদ'আত বলে অভিহিত করা চরম ধৃষ্টতা ও অমার্জনীয় অপরাধ নিঃসন্দেহে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, নামায-রোযা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলার যিকির; বরং বড় যিকির, যা আমরা পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি। সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, নামাযীকে বলা হচ্ছে,

كأنما تناجي ربك.

অর্থ : তুমি এমনভাবে নামায আদায় কর, যেন তুমি তোমার রবের সঙ্গে কানাকানি করছ, গোপন প্রেমালাপ করছ।

হাদীসে জিবরাঈলে আছে,

ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.

অর্থ : এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি তোমার রবকে দেখতে পাচ্ছ, যদি এত উচ্চস্তরে ওঠতে সমর্থ না হও তবে এ কথা তো নিশ্চিত যে, তিনি সর্বক্ষণ তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।

তুমি যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (একমাত্র তোমারই ইবাদত করছি, অন্য আর কারো ইবাদত করি না, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি, অন্য আর কারো সাহায্য কামনা করি না) উচ্চারণ করছ, তখন কি তুমি সত্যিই তাঁরই সঙ্গে বাক্যালাপ করছ? না সমগ্র পৃথিবী একবার পরিভ্রমণ করে আসছ? বুকে হাত দিয়ে সত্য কথা বল। ইমাম গাযালী রহ. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবে লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

অর্থ : পানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা মুখে উচ্চরণ কর তা জানতে সক্ষম হও। (সূরা নিসা-৪৩)

এর উপর ভিত্তি করে আমরা (ইমাম গাযালী রহ.) বলতে পারি যে, পার্থিব মোহ-মদে উন্মত্ত ব্যক্তি, যে নামাযে কী উচ্চারণ করছে তা হতে সম্পূর্ণ গাফিল, কিছুই খবর রাখে না, সেও তো এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসে যাবে। (আল্লাহ তা'আলা গফূরুর রহীম ক্ষমা করুন!)

ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের সারসংক্ষেপ আইনুল ইলম গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

الخشوع هو حقيقة الصلوة فهو فرض عين وان انكره الفقهاء.

একাগ্রতা, নিবিষ্টতাই হল নামাযের প্রাণ, কাজেই তা ফরযে আইন। যদিও ফকীহগণ তা অস্বীকার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ফকীহগণ তা অস্বীকার করেননি, তারা নিজেরা এই খুশু'র সাথেই নামায আদায় করেছেন, তারা আমার মত নামাযীকে ফরয আদায়ের দায়মুক্ত করার উদ্দেশ্যে খুশু'কে নামাযের ফরযে আইন নির্ধারণ না করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ আমি এবং এসব চুনোপুটি সালাফীরা তো যে নামায আদায় করি, তা কবির ভাষায় বলতে গেলে-

جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا،
ترا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملیگا نماز میں۔

অর্থ : যদিও কখনো সিজদায় মাটিতে রেখেছি মাথা, মৃত্তিকা হতে আসিছে প্রতিধ্বনি, হৃদয় তোমার প্রতিমাসক্ত, এ নামাযে শূন্য রহিবে তব হৃদয়ের অঞ্চলখানি।

পথিপার্শ্বের ডোবায় বর্ষার পানিতে লম্ফ-ঝম্প প্রদানকারী সালাফী নামের টাকি মাছেরা কুরআন-হাদীসের অতলান্ত সাগরের কী খবর রাখবে? তারা তো আমাদের জাতীয় কবির ভাষায়-

'ফল বহিয়াছ, পাওনিকো রস, হায়রে ফলের ঝুড়ি!

লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি।'

এতো হল সর্বপ্রধান ইবাদত নামাযের অবস্থা, দ্বিতীয় ইবাদত রোযার সম্পর্কে হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزى به، والصيام جنة واذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرء صائم.

অর্থ : আদম সন্তানের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান সে পাবে (অন্য হাদীসের বর্ণনানুযায়ী ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত) কিন্তু রোযা, এতো শুধুমাত্র আমারই জন্য। কাজেই আমি স্বহস্তে এর প্রতিদান দিব (অথবা আমি নিজেই এর প্রতিদান হয়ে যাব! সুবহানাল্লাহ)। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা পাপ কর্ম হতে ঢাল বা বর্মস্বরূপ (অন্য হাদীসে আছে, যতক্ষণ পাপ কর্ম করে তা ছিদ্র না করে ফেলে)। যখন তোমাদের কেউ দিনে রোযা রাখবে, তখন সে যেন অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ না করে, ঝগড়াঝাঁটি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মারামারি করতে উদ্যত হয়, তখন যেন সে বলে দেয়, ভাই আমি রোযাদার। (সহীহ বুখারী; হা.নং হিন্দুস্তানী নুসখা ১/২৫৫)

অথচ রোযা রেখে আমরা অবলীলাক্রমে সর্বপ্রকার পাপ ও অন্যায় কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ি। যোহরের পর হতে আমাদের মেযাজ তো এরূপ গরম হয়ে ওঠে যে, তপ্ত কড়াইয়ে তেলের ছিটা দিলে যেমন ছ্যাত ছ্যাত করে ওঠে। তাই তো আমাদের রোযার যোগফল হাদীসের ভাষায় كم من صائم ليس له الا الجوع বহু রোযাদারের থলিতে সারাদিনের রোযার ফসল ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। রোযা তো আমাকে মুত্তাকী-সংযমী, বর্জনকারী বানাবে, খাদ্য-পানীয় হতে ক্রমে ক্রমে সবকিছু পরিহার করে আমি একমাত্র আল্লাহর স্মরণ ও প্রেমে বিভোর হয়ে যাব। সারাজীবন রোযা রেখে কি আমি এ পথে এক পদও অগ্রসর হতে পেরেছি? যাকাত তো যাকাতদাতার অন্তর হতে অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসা দূর করে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে তার মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনকিছুর চিন্তাই স্থান পাবে না। অথচ আমাদের যাকাতদাতাগণের মাঝে শতকরা ক'জনকে আপনি এরূপ পাবেন? হজ্জ তো হজ্জ আদায়কারীকে সদ্যপ্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ করে দেয়, জান্নাত ছাড়া হজ্জে মাবরূর (মাকবূল হজ্জ) এর আর কোন প্রতিদান নেই। হজ্জ তো আল্লাহ প্রেমিকদের প্রেমের লীলাখেলার ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয়ারই এক লীলাখেলা। অথচ হজ্জ করতে গিয়ে আমরা সেই পুণ্যভূমিতে ইয়াহুদী-নাসারাদের পণ্যে ভরা মার্কেটিংয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কী করে থাকি?

প্রশ্ন হল, আমার আধ্যাত্মিক জীবনের এই পুষ্টিকারক উপাদেয় খাদ্য কেন আমার আধ্যাত্মিক শক্তিকে সবল করার পরিবর্তে দুর্বল করে ফেলছে? যখন কোন ব্যক্তির শরীরে পুষ্টিকারক খাদ্য পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়, তখন তার

পরিপাকের সহায়ক ওষুধ ব্যবহার করাই কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়? তাই উপরে বর্ণিত আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিকারক খাদ্য ইবাদত-বন্দেগীকে আমাদের জন্য পুষ্টিকর বানানোর জন্য সুফিয়ায়ে কেরাম যিকরুল্লাহর ওষুধের নানাবিধ ব্যবহারের পথ-পন্থা উদ্ভাবন করেছেন মাত্র, যা ইবাদত বন্দেগীকে সত্যিকারের ইবাদত-বন্দেগীতে রূপান্তরের উপায় মাত্র। ইবাদত যখন সত্যিকারের ইবাদতে পরিণত হবে, তখন তার অনিবার্য ফলস্বরূপ আখলাকে হাসানা বা চরিত্র মাধুর্য ফুটে উঠবে। এজন্য তরীকতপন্থী শাইখের জন্য আমলদার আলেম, সুন্নাতে মুতাহ্হারার পূর্ণ অনুসরণকারী, সকল প্রকার অন্যায়, পাপকর্ম এমনকি সন্দেহজনক কর্মসমূহ সযত্নে পরিহারকারী, সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রসনা সিক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস যিকরুল্লাহর সুগন্ধে আমোদিত, হৃদয়-মন আল্লাহ তা'আলার ইশক-মুহাব্বত, প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ, সর্বোপরি অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মাশাইখে কামেলীনের ধারাবাহিকতা বর্তমান থাকা জরুরী ও অপরিহার্য।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের সুলূক-তরীকতপন্থী মাশাইখে কেরাম একদিকে নিজেদের জীবনে উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী, অপরদিকে তারা গোটা উম্মতের হিদায়াত ও ইসলামের জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ, বিরাম-বিশ্রাম কুরবানী করে গেছেন। রাতের আঁধারে নিজের ও গোটা উম্মতের কল্যাণ কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন। দিনের বেলায় শিরক বিদ'আতের মূলোৎপাটনে, জুলুম-সংগ্রাম অত্যাচারের প্রতিরোধে দুর্জয় সাহসে অগ্রসর হয়েছেন। সকল প্রকার বাতিল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। কোন রাজশক্তির নির্যাতন-নিপীড়ন তাদেরকে এ জিহাদ হতে মুহূর্তের জন্যে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এরাই সত্যের পতাকাবাহী সেই অকুতোভয় সেনাদল, যাদের সম্পর্কে হাদীসে নববীতে সুসংবাদ দান করা হয়েছে-

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.

অর্থ : আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল সদা-সর্বদা হক ও সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকবে, কারো বিরোধিতা, জুলুম-নিপীড়ন তাদেরকে সত্যপথ হতে বিন্দুমাত্র টলাতে পারবে না।

আকাবিরে দেওবন্দ (রহ.) এই সত্যের পতাকাবাহীদের অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরার সার্থক উত্তরসূরী। এরা যেমন কুরআন মাজীদ, হাদীসে নববী, তরীকায়ে সাহাবায়ে কেরাম, আইম্মায়ে তাবেয়ীন, ফুকাহায়ে মুজতাহিদীনের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তেমনি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সে জ্ঞানের অনুসরণকারী ছিলেন। এতদসঙ্গে তারা সুলূক-তরীকতের উপর নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মুসলিম জনগণকেও এর শিক্ষাদান করেছেন। এদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাতে নববীর অনুসরণে দৃঢ় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শিরক বিদ'আত, কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচারের মূলোৎপাটনে সর্বদাই অগ্রণী থেকে জাতি ও সমাজকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। পরাক্রমশালী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ ও সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। বাকশক্তির মাধ্যমে ওয়ায-নসীহত, লেখনী শক্তির মাধ্যমে অমর ও অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা, দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল বিছিয়ে দেয়া, বছরের পর বছর কুরআন-হাদীসের অধ্যাপনা, মুসলিম সমাজে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানে ফতওয়া প্রদান, প্রবন্ধ রচনা, দীনে ইসলামের উপর আক্রমণকারী শক্তির মুকাবিলায় মুনাযারা-তর্কযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রাম, জেল-জুলুম কবুল করা, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সত্যের জয়গান গাওয়া, এক কথায় মানবীয় সকল প্রকার শক্তি কলা-কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনে মুহূর্তের তরে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। সেই সঙ্গে খানকায় বসে আল্লাহ তা'আলার লাখো লাখো বিপথগামী, দিশেহারা বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের দিশা প্রদান করে গেছেন। এদের খানকাহী পদ্ধতি বা তাসাওউফ-তরীকত অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দীয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া তরীকায় তাবেয়ীকুল শিরোমণি, হাদীস ও ফিকহের ইমাম, হযরত খাযা হাসান বসরী রহ. এর মাধ্যমে মদীনাতুল ইলম হযরত আলী রাযি. হয়ে আকায়ে নামদার, সরওয়ারে কায়েনাত, সাইয়িদুল আউয়ালীন ওয়ালআখিরীন, খাতামুন্নাবিয়্যীন ওয়ালমুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তফা, আহমাদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকে গিয়ে পৌঁছে গেছে। সম্ভবত শেষ জীবনে ইরাকে অবস্থানের ফলে এ নবুওয়াতী তাযকিয়া ও তাওহীদের সিলসিলা মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চলে হযরত আলী রাযি. এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। সাইয়িদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি., ফারূকে আযম উমর রাযি., উসমান গণী রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের রূহানী সিলসিলা সৌদি আরব, মিশর, সুদান, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মরক্কো হয়ে আন্দালুস বা মুসলিম স্পেন ও অন্যান্য মুসলিম দেশে পৌঁছে গেছে। এক কথায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াতে কিতাব, তা'লীমে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীস ও তাফসীর) এর ফারায়েযে মানসাবে রিসালাতের ন্যায় তাযকিয়ার ফরীযাও সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে গেছে, যা ঐতিহাসিক সত্য। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, তানযীলুয যিক্‌র ও তার হিফাযত-সংরক্ষণ যেমন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে, তেমনি এ শাজারায়ে তাইয়িবা পত্র-পল্লবে, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে চৌদ্দশত বছর যাবত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে মানবাত্মার খোরাক যুগিয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। বাইয়াত ও তাসাওউফ সম্পর্কে আমার মত অজ্ঞ-মূর্খ– যে কিনা এ জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত– কী লিখব? তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগ হতে আইম্মায়ে দীন কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর আলোকে বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

কুতুবুল আলম হযরত মাদানী রহ. এর একটি মূল্যবান ওয়ায 'ইহসান ও সুলূক' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। চার খণ্ডের হাজার পৃষ্ঠার ঊর্ধ্বে মাকতূবাতে শাইখুল ইসলাম গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তির পত্রের উত্তরে হযরত মাদানী রহ. বহু পত্র লিখেছেন, সুলূক ও তরীকাত শিরোনামে, ঐসব পত্র স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থে ও মাওয়ায়েযে এতদসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত হাজী সাহেব রহ. এর যিয়াউল কুলূব ও হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর ইমদাদুস সুলূক গ্রন্থ দু'খানা অত্যন্ত মূল্যবান। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর মাকতূবাত 'মাকতূবাতে ইমামে রাব্বানী' নামে বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তাসাওউফ ও তরীকত সম্পর্কে অতি উচ্চাঙ্গের আলোচনা রয়েছে এসব গ্রন্থে। ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ

রহ. এর আলকউলুল জামীল এতদসম্পর্কীয় অতি মূল্যবান গ্রন্থ। ইমাম গাযালী রহ. ও হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর গ্রন্থাবলী সারা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। এসব গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

ফলকথা চৌদ্দশত বছর যাবত আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাআতের সকলেই তাসাওউফ ও সুলূকের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছেন। তাই তাসাওউফ ও সুলূকের এ সর্বজনবিদিত প্রবাহমান অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করা ঈমানহারা হওয়ার নামান্তর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

সংগ্রহ : মাওলানা আব্দুল হান্নান
শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

(৭নং পৃষ্ঠার পর; বাংলাদেশের স্বাধীনতা)

সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অনুমান করতে লক্ষ্য করুন, বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামের পলো গ্রাউন্ডে সমাবেশ করতে এলে মাওলানা সাহেব তৃতীয় বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন।

প্রিয় পাঠক! আলেম মুক্তিযোদ্ধার ফিরিস্তি চাওয়া জাতির প্রতি তাদের ইংরেজ খেদাও আন্দোলন থেকে অদ্যাবধি সকল অবদানকে ম্লান করে দেয়। তারা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরও মাওলানা শাকের হোসেন শিবলী জীবিত বহু আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পেয়েছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা আতাউর রহমান খান, মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ প্রমুখ। এদের ছাড়াও আরো বহু বীর মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া যাবে যারা এই জরীপের আগেই পরলোক গমন করেছেন। বস্তুত উলামায়ে কেরাম যেহেতু রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিলেন না, তাই মুক্তিযুদ্ধের পর তারা আবার মসজিদ মাদরাসা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যা তাদের দেশের জন্য আত্মত্যাগের এক অপূর্ব প্রমাণ। বিশেষ করে যখন ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়াছড়ি ও সম্মাননার মত কলঙ্কজনক চিত্র আজ আমরা নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করি। তাই একথা আমরা অকপটে বলতে পারি যে, কোন আলেম হানাদারদের পক্ষ সমর্থন করেননি। লুটতরাজ, নারীর ইজ্জত হরণ তো দূরের কথা। এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখতে হলে, বাংলাদেশের বহু জেলায় বা গ্রামে হিন্দুপাড়া আছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন এসব গ্রামের কেউ একথা প্রমাণ করতে পারবে না যে, কোন আলেম তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে উত্যক্ত বা লুট করেছেন। কিংবা তাদের কাউকে পাক-হানাদারদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বরং উলামায়ে কেরামের ঘর বাড়ি ছিল সে সময় হিন্দু ও মুক্তিযোদ্ধাদের শরণার্থী শিবির। পক্ষান্তরে এমন বহু সাধারণ লুটেরা পাওয়া যাবে, যারা হিন্দুদের তাড়িয়ে তাদের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এই স্বাধীন বাংলাদেশেও নিচ্ছে। তারাই আবার মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে রাষ্ট্রীয় ভাতাও গ্রহণ করছে।

তাহলে রাজাকার কারা ছিল?

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় রাজাকার বিষয়ে নিম্নোক্ত বই দু'টিতে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায়।

১. একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়। ২. ঘাতকের দিনলিপি।

এ দু'টি বই অধ্যয়নে আমরা দেখতে পাই– ৭১'এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ভূমিকায় সব শ্রেণী-পেশার লোকজনই বিদ্যমান ছিল। শেরে বাংলার ছেলে ফয়যুল হকও ছিলেন স্বাধীনতা বিরোধী। আর তাঁর কন্যা রাঈসী বেগম তো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ৯ মাস ধরে সাংগঠনিক প্রচারণা চালিয়েছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সন্তানদেরও একই অবস্থা ছিল।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানেরই আনুগত্য প্রদর্শন করে।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়' বইয়ের ১৩৯নং পৃষ্ঠায় 'দালাল বুদ্ধিজীবিদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন' শিরোনামে যা উল্লেখিত হয়েছে, তার সারাংশ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মীর ফখরুজ্জামান জেনারেল রাও ফরমান আলীর কন্যার শিক্ষক হওয়ায় তার ঘনিষ্ঠ হয় এবং তার সহচর (রাজাকার) হিসেবে কাজ করে। তেমনি আরেকজন হলেন, গণিত বিভাগের অধ্যাপক এ.এফ.এম আব্দুর রহমান।

একই বইয়ের ১২১নং পৃষ্ঠায় আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকও পাকবাহিনীর দালালীতে তৎপর ছিলেন। এতে আরো উল্লেখ আছে যে, একশ্রেণীর সাংবাদিকও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

অতএব বোঝা গেল, সাধারণ সমাজে রাজাকারদের ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও পাইকারিহারে টুপি-দাড়িওয়ালাদের রাজাকার বলা 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

দৈনিক আমার দেশ'র সহকারী সম্পাদক সঞ্জীব চৌধুরী লিখেন, 'আধুনিক বলে কথিত এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবির কল্যাণে এমন একটা মিথ্যা আমাদের সমাজে প্রায় সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের আলেম সমাজের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তারা হয় রাজাকার হয়েছে নতুবা গোপনে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, একাত্তরের রাজাকারদের মধ্যে টুপি-দাড়িওয়ালা লোকের চেয়ে দাড়ি কামানো 'আধুনিক' লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এ আলেম সমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তাদের অবদান ও আত্মত্যাগ অন্যদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।'

মোটকথা, ১. আলেম-উলামা বা টুপি-দাড়ি মানেই রাজাকার নয়। এঁরা জাতির জন্য নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাওয়া নিবেদিত প্রাণ আল্লাহর বান্দা।

২. ৪৭'এ পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ কেবল একটি দুঃস্বপ্নই হয়ে থাকতো। তাই ৪৭'এ উলামায়ে কেরামের অবদানকে শ্রদ্ধা করা এবং নতুন প্রজন্মকে ৪৭'এর সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ করে দেয় আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. একাত্তর ও একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'রাজাকার' শব্দটি মুনাফিকের সমার্থবোধক। সহজ বাংলায় যার অর্থ 'গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক'। তাই স্বাধীনতার এ ৪৪ বছর পরও যদি কেউ দেশ ও দেশবাসীর সাথে মুনাফিকী করে, বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়। হত্যা, গুম, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের বাজার বসায়, তাহলে ষোল কোটি বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে সেও নরপিশাচ হানাদার এবং অন্যতম একজন মুনাফিক। বর্তমানের পরিভাষায় সেও একজন রাজাকার।

আলহাদুলিল্লাহ! আলেমদের জীবন এ জাতীয় অপরাধ ও কলঙ্ক থেকে বর্তমানেও মুক্ত, ভবিষ্যতেও মুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। বস্তুত আলেমরা কখনোই দেশ ও জাতির প্রতিপক্ষ হননি, কোন জাতি-গোষ্ঠির গোলামী করেননি; বরং মানুষকে গোলামীমুক্ত জীবনের পথ দেখিয়েছেন এবং দেখাতেই থাকবেন। তারা জাতিকে ন্যায়-নিষ্ঠার সবক দিয়েছেন এবং দিতেই থাকবেন। অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং লড়তেই থাকবেন। এ এক জ্বলন্ত বাস্তবতা যা অনুধাবন করতে হলে মুর্দা নয়; যিন্দা দিলের প্রয়োজন, যার চোখ-কান সব সুস্থ আছে; ব্যাধিগ্রস্ত নয়।

লেখক : খতীব, বাইতুল আমান জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আত্মসংশোধন ও সৎপথ অর্জনের জন্য সর্বযুগে দু'টি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা মানব সভ্যতা তীব্রভাবে অনুভব করেছে।

(এক) আসমানী হিদায়াত তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা।

(দুই) আসমানী নির্দেশনার উপর যথাযথ আমল করার জন্য 'শিক্ষক'-এর উপস্থিতি।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই দু'টি ধারা চালু করেছেন। (এক) কিতাবুল্লাহ তথা আসমানী কিতাব অবতরণ। (দুই) রিজালুল্লাহ তথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম প্রেরণ।

এটা মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি শুধু কিতাব পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি; কিতাবের নির্দেশনা সঠিকভাবে উপলব্ধি ও আমল করার জন্য শিক্ষকও পাঠিয়েছেন। যারা যুগে যুগে মানবজাতির আত্মসংশোধন এবং ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সফলতা অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে আত্মোৎসর্গিত হয়েছেন। (মা'আরিফুল কুরআন; সূরা বাকারা-১২৯)

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ কয়েকজন নবীর জীবনী ধারাবাহিকভাবে পেশ করব ইনশাআল্লাহ। এর পূর্বে আম্বিয়া আ. এর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

আম্বিয়া আ. এর সংখ্যা

নবী রাসূলগণের সর্বমোট সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেননি। কুরআনে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, নবী রাসূলগণের কারো কারো কথা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে জানিয়েছেন আর কারো কারো কথা জানাননি। ইরশাদ হচ্ছে,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

অর্থ : আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতিপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলিনি। (সূরা নিসা-১৬৪)

লোকসমাজে প্রসিদ্ধ আছে, নবী রাসূলগণের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। কিন্তু প্রকৃত কথা হল, নবী-রাসূলগণের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে (আমাদের অনুসন্ধান মতে) কোন 'সহীহ হাদীস' বিদ্যমান নেই। দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের স্পষ্ট বর্ণনা সংবলিত সনদসহ কোন হাদীস আমরা হাদীসের কিতাবগুলোতে পাইনি। তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে এক দীর্ঘ বর্ণনার শেষাংশে রয়েছে, '(হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন,) আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, নবীদের সংখ্যা কত? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একলক্ষ চব্বিশ হাজার। তাদের মধ্যে তিনশত পনের জনের বড় একটি জামাআত হলেন রাসূল।' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২২৮৮)

এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র (اسناد) অত্যন্ত দুর্বল (ضعيف جدا)। অনুরূপভাবে সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবু যর রাযি. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নবীদের সংখ্যা একলক্ষ বিশ হাজার, রাসূলের সংখ্যা তিনশত তের উল্লেখ করা হয়েছে। (হা.নং ৩৬১) এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রও অত্যন্ত দুর্বল। সামগ্রিক বিচারে নবী-রাসূলদের ব্যাপারে বর্ণিত উল্লিখিত সংখ্যাটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বলে অনুমিত হয়। সুতরাং নবী-রাসূলদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

কাজেই নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান রাখার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর সীমাবদ্ধ থাকা সতর্কতা পরিপন্থী। মোল্লা আলী কারী রহ. মিরকাতুল মাফাতীহ গ্রন্থে নবীদের সংখ্যা সংবলিত হাদীসের ব্যাপারে বলেন,

العدد في هذا الحديث وإن كان مجزوما به لكنه ليس بمقطوع فيجب الإيمان بالأنبياء والرسل مجملا من غير حصر في عدد لئلا يخرج أحد منهم ولا يدخل أحد من غيرهم فيهم.

অর্থ : এ হাদীসে যদিও আম্বিয়া আ. এর সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তবে তা 'অকাট্য' নয়। সুতরাং বিশেষ কোন সংখ্যার মাঝে সীমাবদ্ধকরণ ছাড়াই সকল নবীর উপর ঈমান রাখতে হবে। যাতে সংখ্যাতত্ত্বের কারণে কোন নবীর উপর ঈমান না আনা কিংবা নবী নয় এমন কারো উপর ঈমান আনার আশঙ্কা সৃষ্টি না হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ; হা.নং ৫৭৩৭)

হযরত আদম আ. এর নবুওয়াত ও সহীফা প্রসঙ্গ

হযরত আদম আ. যে আম্বিয়া আ. এর মধ্যে সর্বপ্রথম নবী ছিলেন, তা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আদম আ. কি নবী ছিলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, (তিনি নবী ছিলেন) শুধু তাই নয়, আল্লাহ তা'আলার সাথে তার কথোপকথনও হত।' (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৬১৯০)

হযরত আদম আ.এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী সহীফার সংখ্যা কত ছিল? এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল আসীর রহ. (৬৩০হি.) তার আল-কামেল ফিত-তারীখ (১/৪২) গ্রন্থে বলেন,

وأنزل الله عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبريل.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আদম আ. এর প্রতি একুশটি সহীফা (ছোট কলেবরের আসমানী কিতাব) অবতীর্ণ করেন। হযরত জিবরাঈল আ. আসমানী সহীফাসমগ্র হযরত আদম আ. কে শিখিয়ে দিলে তিনি তা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করে নেন। (তারীখে ত্বাবারী ১/৯৪, আল-কামেল ১/৪২)

হযরত আদম আ. এর দৈহিক গঠন ও আকৃতি

হযরত আদম আ. এর দৈহিক গঠন ও আকৃতি সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ এর এক বর্ণনায় আছে, 'হযরত আদম আ. ষাট হাত পরিমাণ দীর্ঘদেহী ছিলেন।' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১০৯১৩)

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে,

إن الله خلق آدم على صورته.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আদম আ. কে বিশেষ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আদম আ. অপরিবর্তিত গঠনাকৃতির অধিকারী ছিলেন। সাধারণ মানব সন্তানের ন্যায় সৃষ্টির স্তরগুলো (শুক্রবিন্দু,

জমাট রক্ত, গোশতপিণ্ড, এরপর ভূমিষ্ঠ হওয়া, শৈশব, কৈশোর ইত্যাদি) তাকে অতিক্রম করতে হয়নি। (আল-কাশেফ আন হাকায়িকিস সুনান [আল্লমা তীবী রহ.]; হা.নং ৩৫২৫)

দুনিয়ায় অবতরণ

হযরত আদম আ. (বাহ্যদৃষ্ট অন্যায় হতে) ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মহান আল্লাহর খলীফারূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তিনি ভূখণ্ডের কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ বিষয়টি মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। কেননা পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসে অবতরণের ভূখণ্ড চিহ্নিত করা হয়নি। ইবনে উমর রাযি. এর মতে হযরত আদম আ. সাফা পাহাড়ে এবং হাওয়া আ. মারওয়া পাহাড়ে অবতীর্ণ হন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১১০)

ইবনে আব্বাস রাযি. এর মতে আদম আ. হিন্দে এবং হাওয়া আ. জেদ্দায় অবতীর্ণ হন। আরাফার ময়দানে তাদের পুনর্মিলন ঘটে। (তারীখে তৃবারী ১/৭৯)

তবে অবতরণের ভূখণ্ড নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সেটাই যা আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. তার তাফসীরে ইবনে কাসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم، أودنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أورسوله صلى الله عليه وسلم.

অর্থ : হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. এর অবতরণের ভূখণ্ড সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনাগুলোর ভিত্তি মূলত (কুরআন-হাদীস নয়; বরং) ইসরাঈলী বর্ণনা। যার শুদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তাছাড়া (আদম আ. ও হাওয়া আ. এর) অবতরণের ভূখণ্ড নির্ধারণে যদি আমাদের জন্য কোন ফায়দা থাকত, তবে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; সূরা আ'রাফ-২৩)

পবিত্র কা'বা ঘরের স্থানে গমন

আল্লামা ইবনে জারীর তৃবারী রহ. তার তারীখে তৃবারী গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, '(পৃথিবীতে অবতরণের পর) হযরত আদম আ. কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! আমার আরশ বরাবর নিচে পৃথিবীতে একটি পবিত্র স্থান রয়েছে। তুমি সেখানে যাও এবং আমার (ইবাদতের) জন্য সেখানে একটি ঘর নির্মাণ কর। অতঃপর তা তওয়াফ কর। যেভাবে আমার ফেরেশতারা আমার আরশ তওয়াফ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কা'বা ঘরের স্থান চিহ্নিতকরণের জন্য একজন ফেরেশতা পাঠালেন এবং তাকে হজ্জের নিয়ম শিক্ষা দিলেন। (তারীখে তৃবারী ১/৮০)

রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতি গ্রহণ

মানুষ যেন দোজাহানে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সন্তোষভাজন হয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারে এজন্য মহান আল্লাহ জীবন বিধানরূপে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তা শিক্ষাদানের জন্য আম্বিয়া আ.কে পাঠিয়েছেন শিক্ষক হিসেবে। পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার জন্য বিশ্বজগতের পরতে পরতে ছড়িয়ে রেখেছেন কুদরতের অপার নিদর্শন। মানুষ ও জিন জাতি থেকে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি। (মা'আরিফুল কুরআন; সূরা আ'রাফ-১৭২)

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعنى عرفة فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.

অর্থ : (আল্লাহর খলীফারূপে পৃথিবীতে অবতরণের পর) না'মান তথা আরাফার ময়দানে আল্লাহ তা'আলা বনী আদম থেকে (নিজের রব হওয়ার) স্বীকৃতি নেন। (কিয়ামত পর্যন্ত যত বনী আদম দুনিয়াতে আসবে সকলকে) অণু আকারে আদম আ. এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেন। তারপর তাদেরকে সামনাসামনি সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? বনী আদম বলল, নিশ্চয়ই, (আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের রব। আর এ সাক্ষ্য আমি এজন্য নিচ্ছি) যেন কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, আমরা অনবহিত ছিলাম। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৪৫৫, তারীখে তৃবারী ১/৮৬, মা'আরিফুল কুরআন; সূরা আ'রাফ-১৭২, আল-কামিল ১/৩৭)

হযরত আদম আ. এর খাদ্যগ্রহণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ

আল্লামা ইবনে জারীর তৃবারী রহ. (৩১০হি.) তার তারীখে তৃবারী গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূত্রে একটি দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। শেষাংশে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

اهبط من الجنة وكانا يأكلان فيها رغدا فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصده ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله.

অর্থ : জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ ও সুখময় জীবন থেকে দুনিয়ার কষ্টকর জীবনে আসার পর আদম আ.কে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে লৌহকর্ম ও চাষাবাদ শিক্ষা দিলেন। আদম আ. ফসল বোনা, তাতে পানি সিঞ্চন করা, কাটা, মাড়াই করা, অবশেষে পিষে আটার খামিরা তৈরি করে রুটি বানিয়ে খাওয়া পর্যন্ত কৃষি কাজের কষ্টকর সকল স্তর আপন হস্তে সম্পন্ন করলেন। (তারীখে তৃবারী ১/৮৩, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১২৪, মা'আরিফুল কুরআন; সূরা তৃা-হা-১১৭)

দুনিয়াতে অবতরণের পর হযরত আদম আ. এর পোশাক কী ছিল? এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

أمره أن يذبح كبشا من الضأن من الثمانية الازواج التى أنزل من الجنة فأخذ كبشا فذبحه ثم أخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه هو وحواء فنسج آدم جبة لنفسه وجعل لحواء درعا وخمارا فلبسا ذلك.

অর্থ : আল্লাহর নির্দেশে আদম আ. দুনিয়ায় অবতীর্ণ আট জোড়া জানোয়ারের মধ্য হতে একটি ভেড়া জবাই করলেন। অতঃপর হাওয়া আ. কর্তৃক উক্ত ভেড়ার পশমের তৈরি সুতা দ্বারা নিজের জন্য একটি জুব্বা এবং হাওয়া আ. এর জন্য জামা ও ওড়না বুনন করে উভয়ে পরিধান করলেন। (তারীখে তৃবারী ১/৮১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১২৪)

আদম আ. এর সন্তান সন্ততি

হযরত হাওয়া আ. থেকে হযরত আদম আ. এর সরাসরি ঔরসজাত সন্তান মোট কতজন ছিল? এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে জারীর তৃবারী রহ. (৩১০হি.) তার তারীখে তৃবারী গ্রন্থে দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাকের মতে হযরত আদম আ. এর ঔরসে হাওয়া আ. এর গর্ভে বিশবারে দুজন দুজন করে (একটি ছেলে একটি মেয়ে) সর্বমোট চল্লিশজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

তবে কারো মতে আদম আ. এর সরাসরি ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা ছিল দুইশত চল্লিশজন। হাওয়া আ. মোট একশত বিশবার **(২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... *অর্থ : এবং যারা কুফ্‌র অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)*

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৯

আমার পরম শ্রদ্ধেয় নানাজী একজন বা-আমল আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন নাহব-সরফ তথা আরবী গ্রামারের একজন সুদক্ষ শিক্ষক। নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার। আজীবন শিক্ষকতা করেছেন। নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ মাদরাসার শিক্ষকতায় কেটেছে জীবনের বিরাট একটা অংশ। তবে কর্মজীবনের শুরু ও শেষের অংশটি কাটিয়েছেন নিজ এলাকার অতি প্রাচীন একটি মাদরাসায়। যে কোন তালিবে ইলমকে পেলেই আরবী গ্রামারের আলাপ জুড়ে দিতেন। তার পরীক্ষা নিতেন। ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসলে কিংবা আমরা নানার বাড়িতে বেড়াতে গেলে আরবী সরফ-নাহবই হতো আমাদের সাথে নানাজীর গল্পের বিষয়। এমনকি রাতে বাতি নিভিয়ে শোয়ার পরও ঘুমানোর আগ পর্যন্ত চলতো সরফ ও নাহবের ক্লাস। ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম রহ. ও বরুড়ার হযরত মাওলানা কোরবান আলী সাহেব রহ. ছিলেন তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্ব। বিদ‘আত ও বিদ‘আতপন্থীদের বেলায় ছিলেন চরম আপোষহীন। ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনীদের বৈবাহিক আত্মীয়তার ক্ষেত্রে রূপ-সৌন্দর্য ও বংশ-সম্পদের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতেন সুন্নাত-বিদ‘আতের বিষয়কে।

তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা। সব ছেলেকেই আলেম বানাতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থজন তাঁর আশা পূরণের তাওফীক পেয়েছেন। দ্বিতীয়জন একদম শুরুতেই বাবাকে নিরাশ করেছেন। মাদরাসার সাথে সাথে সব ধরনের পড়া-শোনাকেই বিদায় জানিয়েছেন। বড়জন ছিলেন ঈর্ষণীয় মেধার অধিকারী। তিনি মাদরাসায় কয়েক জামাআত পড়ার পর কিছু নির্বোধ হিতাকাঙ্ক্ষির কুপরামর্শে তিনি মাদরাসা ছেড়ে স্কুলে ভর্তি হন। মেট্রিক ফাইনাল পরীক্ষায় এত ভালো ফলাফল করেছেন যে, দশ মাইল দূর থেকেও লোকেরা তাকে দেখতে এসেছে। এরপর ইন্টারে ও ডিগ্রীতেও ভালো রেজাল্ট করেছেন। যার ফলে তার ছাত্রজীবনের হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে অনেক তোষামোদ করে শিক্ষকতার পদে নিয়োগ দেন। আমার আব্বা বরাবরই বলতেন, মাদরাসার লাইনে থাকলে তিনি আজ বড় কোন মাদরাসার মুহাদ্দিস পদে খিদমত করতেন। বাল্যকালে পড়া মাদরাসার কিতাবগুলো তার মধ্যবয়সেও তাজা ইয়াদ ছিল। আমাদের সঙ্গে ফারসী ও আরবীতে মাঝে-মধ্যে হাস্য-রসিকতা করতেন।

শিক্ষক জীবনের শুরুতেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তে। নামী-দামী পরিবার থেকে আসছে বিয়ের প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের দৌড়ে বিজয়ী হয়েছে এলাকার এক ধনী পরিবার, যারা পরবর্তীতে রাজনৈতিকভাবেও স্থানীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে আমরাও পরিচয় দিতে গিয়ে বলি যে, অমুক এমপি সাহেবের ভাতিজী আমার বড় মামী। মরহুম এমপি সাহেব আমাদের এলাকার বড় শিল্পপতি। বেকো ইন্ডাস্ট্রিজ, ন্যাশনাল ব্যাংক, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, পূর্বাচল স্টিল মিলসহ আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ভাতিজীকে বিয়ে দেয়ার পরপরই শিক্ষকতার চাকুরী ছাড়িয়ে জামাইকে নিয়োগ দেন নিজ প্রতিষ্ঠান বেকো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর জি.এম পদে। মামা তখন যে জীপগাড়িটি হাঁকিয়ে বাড়ি যেতেন, তখনকার গ্রাম্য রাস্তা তার ভার বহন করতে হিমশিম খেতো। বাড়িতে যে কয়দিন থাকতেন শখ করে মাছ শিকার করতেন। সে সময় তার চাচা শ্বশুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রার্থী লোকজন সুপারিশের জন্য তার পেছনে লাইন দিয়ে রাখতো। মামা-মামীর আপোষেও ছিল পরম অন্তরঙ্গতা। প্রত্যেকেই অপরকে নিয়ে গর্বিত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সংসারে একে একে পাঁচটি পুত্র সন্তান দান করেছেন। বড়জন ছিল আমার ছয় মাসের ছোট। কিন্তু শৈশবেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আর বাকি চারজনের সকলেই তখনো বাল্যবয়সী। কেউ হাইস্কুলে,কেউ প্রাইমারীতে, কেউ মাত্র দুগ্ধপোষ্য। এরই মধ্যে ঘটে যায় এক মহাদুর্ঘটনা।

বেকো ইন্ডাস্ট্রির এক পরিদর্শন কাজে মামা কয়েকদিনের জন্য যশোরে গেলেন। সেখানে গিয়ে হোটেলে না উঠে উঠলেন এক বন্ধুর বাসায়। দিনে সাইট পরিদর্শন, রাতে বন্ধুর বাসায় মেহমান। যশোরে যাওয়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন। বন্ধুটির তার স্ত্রীর সঙ্গে কোন ব্যাপারে ঝগড়া হয়। মামা ছিলেন এ ব্যাপারে একদম অনবগত। রাতে বন্ধুটি ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে। বন্ধুর এমন মর্মান্তিক বিচ্ছেদে সর্বাধিক মর্মাহত হন আমার মামা। তিনি বন্ধুর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থেকে পুলিশের কাছ থেকে অপমৃত্যুর সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন এবং কাফন-দাফনের কাজ সমাধা করে ভগ্ন হৃদয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। বন্ধুর বিরহে আনমনা হয়ে তিনি অফিস করে যাচ্ছেন। হঠাৎ জানতে পারলেন তার নামে মার্ডার কেসের হুলিয়া জারি হয়ে গেছে। বন্ধুর মামা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তার ভাগ্নের স্ত্রীর সঙ্গে মামার নাকি পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্কের জের ধরেই নাকি মামা ও তার বন্ধুর স্ত্রী তার ভাগ্নেকে হত্যা করে ফ্যানে ঝুলিয়েছে। পুলিশের জন্য এ ধরনের মামলা খুবই লোভনীয়। তারা মামাকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরে দিল। ঠিক যেভাবে মিথ্যা মামলাটি সাজানো হয়েছে খবরটি সেভাবেই ছড়িয়ে পড়ল মামার অফিসে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে এবং তার নিজ বাড়িতেও। এদিকে নানা-নানী যুগপৎ লজ্জা ও দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মামী পড়ে গেলেন এক গভীর সংশয়ে ও হতাশায়। অপরদিকে নিহতের স্ত্রী স্বামী হারানোর শোকের চেয়েও বেশি ব্যথিত হলেন একজন নিরাপরাধ মানুষকে মিথ্যা মামলায় হাজতখানায়

ভরে তার পরিবারকে বিপর্যস্ত করায়। বিবেকের তাড়নায় তিনি যশোর হতে আমার মামীর কাছে এসেছিলেন সমবেদনা জানাতে এবং মামীর মনের সন্দেহ দূর করতে। কিন্তু ফলাফল হল সম্পূর্ণ উল্টো। মামীর সন্দেহ এবার বিশ্বাসে পরিণত হল। মহিলা চলে যাওয়ার পরপরই তিনি ক্ষোভে অভিমানে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে চাচাশ্বশুরও মামাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবলেন। হাজত থেকে বের করার বা কোন ধরনের তদবীর করার পরিবর্তে তিনি মামার উচিত শাস্তিই কামনা করতেন। মামাও এদের সকলের অবিশ্বাসের কথা শুনে চরম অভিমানে শ্বশুরপক্ষের কারো কাছ থেকে সাহায্যের ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এভাবে জেলখানায় কেটে যায় বছরের পর বছর। নানার বাড়ির সবকিছুতেই তখন বিষাদ ও অভাবের ছায়া। মামী ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার খরচ দিয়ে যাচ্ছেন তার চাচা। কিন্তু নানার বাড়িতে মামলার খরচ ও পরিবারের বাজার খরচের জন্য একের পর এক জমি বিক্রি চলছে। অবশেষে মামা বে-কসুর খালাস পেয়ে বাড়িতে আসলেন। মামীর কর্মকাণ্ড বিস্তারিত শুনলেন। দীর্ঘ জীবনের জীবনসঙ্গীনীর কাছ থেকে বিপদের সময়ে এমন অবিশ্বাস তিনি মেনে নিতে পারলেন না। নীরবে চলে আসলেন ঢাকায়। কিছুদিন ঘোরঘুরি করে স্বল্প বেতনের একটা চাকুরী নিলেন। অতঃপর একটা বিয়েও করে ফেললেন। বড় মামীসহ আমরা সকলেই ধারণা করেছিলাম, তিনি হয়ত আত্মহত্যাকারী বন্ধুর বিধবা স্ত্রীকেই বিয়ে করেছেন। শুনেছি আমার নতুন মামীটিও চাকুরী করেন এবং শাহজাহানপুরে একটা বাসা নিয়ে তারা নতুনভাবে সংসার শুরু করেছেন। আমার ছোট মামা (যিনি বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়) তখন মালিবাগ জামি'আয় পড়তেন। এক সন্ধ্যায় ছোট মামা আমাকে নিয়ে বড় মামার বাসায় গেলেন। কলিংবেল চাপতেই এক মহিলা এসে দরজা খুলে দিল। আমি ভাবলাম সম্ভবত কাজের বুয়া, যেমন খাটো তেমনি কালো। ছোট মামাকে জিজ্ঞেস করলাম, মামী কোথায়? বললেন, কেন ঐতো, যে দরজা খুলল! আমার আর বুঝতে বাকি রইল না, মামা আসলে বড় মামীকেই ভালোবাসতেন। বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে তার কোন প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল না। এখন একে বিয়ে করেছেন ভালোবাসার জন্য নয়; নিতান্তই বাধ্য হয়ে। সতীনের রূপ-লাবণ্যের খবর ইতোমধ্যে মামীর কানেও পৌঁছেছে। তিনিও নিজের ভুল বুঝতে শুরু করেছেন।

যাহোক, মামার এখন দু'টি সংসার। তিনি থাকেন দ্বিতীয়টি নিয়ে, আর প্রথমটি থাকে ধনাঢ্য চাচার খরচে কুমিল্লা শহরে। কিছুদিন পরে শুনলাম দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে মামার একটা ছেলে হয়েছে। মামা আদর করে তার নাম রেখেছেন তাপস। মামার জৌলুসপূর্ণ জীবন এত ক্ষণস্থায়ী হবে কেউ ভাবতে পারেনি। আসলে পতনের বীজ তো সেদিনই রোপণ করা হয়েছিল যেদিন তিনি দীনী শিক্ষা ছেড়ে জেনারেল শিক্ষার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বোঝার জন্য আমাদেরকে এ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র। এখন দিন যত যায় কেবল পতনই তরান্বিত হয়। শেষ জীবন তো কেঁদে কেঁদেই কাটালেন। সেই কাঁদার কাহিনী হয়তো আপনার মনও ভিজিয়ে দেবে। **(অসমাপ্ত)**

আবু তামীম

(২৯নং পৃষ্ঠার পর; অযীফাসমগ্র)

এ সংকলনটি পকেট সাইজে তৈরি সহজে সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করার উপযোগী করে তৈরি করা বইটির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, চলমান সময়ের অন্যতম হাদীস বিশারদ মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা. এর খিদমতও এর সাথে মিশে আছে।

৪. প্রিয় নবীজীর প্রিয় সুন্নাত। মূল : পীরে কামেল হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহ.। অনুবাদ : মুফতী হাবীবুর রহমান। প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ।

৫. রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকবূল দু'আ। মূল : মুফতী আব্দুছ ছালাম চাটগামী। অনুবাদ : মুফতী হিফজুর রহমান। প্রকাশক : মাকতাবায়ে শাইখুল ইসলাম।

৬. দু'আ : ফযীলত ও কবুল হওয়ার উপায়। মূল : হাফেয মাওলানা মুফতী হিদায়াতুল্লাহ; শিক্ষক, জামি'আ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা। সম্পাদনা : মাওলানা খন্দকার মনসুর আহমদ। প্রকাশনা : দাওয়াতুস সুন্নাহ প্রকাশনী।

৭. দু'আ ও আমল। গ্রন্থনা : হাফেয মাওলানা নাজীবুল্লাহ সিদ্দীকী। সম্পাদনা : মুফতী কিফায়াতুল্লাহ আল আযহারী। প্রকাশনা : আল-মানহাল প্রকাশনী।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

(২৫নং পৃষ্ঠার পর; আম্বিয়া আ.)

যমজ সন্তান প্রসব করেন। একশত বিশজন ছেলে এবং একশত বিশজন মেয়ে। (তারীখে তবারী ১/৯২, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১২৯)

হযরত আদম আ. এর মৃত্যু

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় আছে, 'আদম আ. এর মৃত্যুকালে ফেরেশতাদের একটি মুবারক জামাআত কাফনের কাপড়, হানূত (সুগন্ধী বিশেষ) এবং কবর খননের সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হলেন। এরপর তার জান কবয করলেন। গোসল দেয়া, জানাযা নামায পড়ানো, কাফনের কাপড় পরানো, সুগন্ধী লাগানো এবং দাফনসহ যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত ফেরেশতারা সম্পন্ন করলেন এবং আদম আ. এর সন্তানদের লক্ষ্য করে বললেন,

يا بني آدم هذه سنتكم.

অর্থ : হে আদম সন্তান! (কাফন-দাফনের) এ পদ্ধতিই তোমাদের জন্য অনুসরণীয়। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২১২৪০, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৩১)

আদম আ. এর বয়স

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ও হযরত আবু হুরাইরা রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন,

أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنة.

অর্থ : লওহে মাহফূযে হযরত আদম আ. এর হায়াত লিখিত আছে এক হাজার বছর। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৩২)

তবে হযরত আদম আ. এর জান্নাতে অবস্থানের সময়কাল ও দুনিয়াতে অবস্থানের সময়সীমা সম্পর্কে ভিন্নমতও রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) ইবনে জারীর তবারী রহ. এর সূত্রে সমন্বয় সাধনপূর্বক বলেন, 'আদম আ. জান্নাতে অবস্থান করেন ৪৩ বছর এবং দুনিয়াতে অবস্থান করেন (সৌরবর্ষ হিসেবে ৯৩০ বছর এবং চান্দ্রবর্ষ হিসেবে) ৯৫৭ বছর। এভাবে সর্বমোট এক হাজার বছর হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/১৩২)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

গ্রন্থ পরিচিতি

অযীফাসমগ্র

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

আমাদের ছোট সময়ে রমাযান মাস পুরোটাই পড়তো শীতকালে। শীত উপলক্ষে নানাবাড়ি যাওয়া হত প্রতি বছর। সকালে লেপের নিচে যখন ঘুম ভাঙতো কুরআনের তিলাওয়াত ও দু'আ-দুরূদের সুমধুর সুর হত আমাদের দিনের প্রথম শ্রবণ। আমাদের মা-খালা-নানীরা ফজরের পর তিলাওয়াত, অযীফা সেরে তবেই নাস্তা তৈরির জন্য রান্নাঘরে যেতেন। এটা ছিল তাদের নিত্যদিনের কর্মরুটিন। মূলত এ দেশের দীনী মূল্যবোধের ধারক প্রতিটি পরিবারের চিত্রই ছিল এমন। ফজরের পর পুরুষেরা মসজিদে বসে যেত তিলাওয়াত-দু'আর জন্য। আর ঘরে নূরানী আবেশ তৈরি হতো নারীদের তিলাওয়াত, দু'আর গুঞ্জরণের মাধ্যমে। দীনী দৈন্যের এ যুগেও মানুষের মধ্যে দু'আ-দুরূদ, অযীফার প্রতি আগ্রহ খুব কমে যায়নি। রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে প্রায়ই চোখে পড়ে কোন মেম সাহেব কোন ভাই সাহেব গাড়ি থামিয়ে হকারের কাছ থেকে দু'আ-অযীফার বই কিনছেন। কথা হল, কেন তিনি গাড়ি থামালেন এবং যাত্রা বিরতি দিয়ে বইটি কিনলেন! এর কারণ, দু'আর প্রতি রয়েছে তার রয়েছে অপরিসীম আস্থা, নিবিড় ভালোবাসা। এই আস্থা আর ভালোবাসাই তাকে বইটি খরিদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষের নিষ্পাপ দীনী আবেগকে পুঁজি একদল লোভী মানুষের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের কাছে অর্থটাই অনেক কিছু। দীনের নামে যে আবর্জনা তারা মানুষকে গেলাচ্ছে পরকালে আল্লাহর কাছে এর জবাবদিহিতার বিষয়টি তাদের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। তাই সর্বসাধারণকে তাদের থেকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি জানতে হবে।

অযীফা বলতে কি বুঝায়

'অযীফা' এর প্রায় সমার্থক একটি শব্দ হল মনযিল। সর্বসাধারণের পরিভাষায় অযীফা ও মনযিল শব্দ দু'টি দু'আ-দুরূদ, দৈনন্দিন পঠিতব্য প্রার্থনা সমগ্রকে বুঝায়। কুরআন এবং হাদীসে অসংখ্য প্রার্থনামূলক বাক্যাবলী বিবৃত হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে তা 'কিতাবুল আদ্‌ইয়া' শিরোনামে একত্রিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উলামায়ে কেরাম শুধু দু'আ-দুরূদ সম্বলিত বর্ণনাগুলোকে একত্রিত করে স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ইবনুল জাযারীর দু'আ সংকলন 'হিসনে হাসীন', ইমাম নববীর 'আল-আযকার' সমধিক প্রসিদ্ধি ও পঠিতব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। গত শতাব্দীতে হযরত থানবী রহ. এর সংকলিত 'মুনাজাতে মকবূল', হযরত হাকীম আখতার রহ. এর 'মনযিল'-ও উলামা মহল ও সাধারণ মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষীদের পাঠ উপযোগী করে অসংখ্য অযীফা ও দু'আ-দুরূদের গ্রন্থ অনূদিত কিংবা সংকলিত হয়ে বাজারে এসেছে। এত সব বইয়ের মধ্য থেকে ভালো ও নির্ভরযোগ্য বইটি বেছে নেয়া সকলের জন্য দুষ্কর বটে।

দু'আ-দুরূদ ও অযীফা পাঠের লাভ

দু'আ-দুরূদ ও অযীফা সমগ্র মূলত আল্লাহর কাছে প্রার্থনাবাক্য সমষ্টির নাম। কুরআন ও হাদীসে বান্দাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। প্রার্থনার উপকারিতা ও ফযীলত অনেক। অনেক সংখ্যক বর্ণনায় বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার প্রদর্শন করে (আমার নিকট দু'আ করল না) তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা মুমিন-৬০)

আল্লাহ তা'আলার বাণী, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন, আমার রব্ব তোমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করতেন না যদি তোমরা তাঁর কাছে দু'আ না করতে।' (সূরা ফুরকান-৭৭)

তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। (সূরা নিসা-৩২)

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২২৩৮)

আরেকটি হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আর কিছু নেই।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৩৭০)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দু'আই ইবাদত।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮৪১৫)

উপরোক্ত বর্ণনায় এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, দু'আর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর রহমত, দয়া ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। দৈনন্দিন অযীফা পাঠ বান্দা ও আল্লাহর মাঝে তৈরি করে এক দৃঢ় বন্ধন, যা দুনিয়া-আখিরাতের সফলতা লাভের সকল জটিলতা সহজ করে দেয়।

দু'আ মানব জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে

একজন ব্যক্তি সকালে জাগ্রত হওয়া থেকে পুনরায় বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থা যথা: খাওয়া, ঘুমানো, মসজিদে প্রবেশ করা, বের হওয়া, সফরে যাওয়া, ঋণগ্রস্থ হওয়া ইত্যাদি যাবতীয় অবস্থার জন্য রয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মাসনূন দু'আ। এসব দু'আ পাঠের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনিতে চলে আসে। সম্ভাব্য বিপদ থেকে আল্লাহ তাকে বিশেষ রহমত দ্বারা হিফাযত করেন। বর্ণিত এসব দু'আ অত্যন্ত অর্থবহও বটে। উদাহরণত আমরা সফরের দু'আর শব্দগুলো লক্ষ্য করি, কত পূর্ণাঙ্গ শব্দাবলীর মাধ্যমে বান্দাকে নিরাপত্তা প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যানবাহনে আরোহনকালে পড়তে বলা হয়েছে, 'সুবহানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা...' (অর্থ) 'সকল পবিত্রতা ঐ মহান সত্তার যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করেছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।' তারপর পড়া হয়, 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা...' (অর্থ) 'হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে আপনার নিকট পুণ্য ও ধার্মিকতা প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা করছি এমন আমল যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং আমাদের থেকে এর দূরত্বকে গুটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরের সঙ্গী এবং পরিবার পরিজনের স্থলবর্তী। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি সফরের প্রতিকূলতা থেকে এবং দৃশ্যের বিষণ্ণতা

থেকে এবং সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে বিপর্যয় থেকে।'

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা.বা. এক সফরনামায় লিখেছেন, 'সফর যত আরামের হোক, মানুষ নিজেকে তখন বড় অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করে। কিন্তু মুমিন যখন সফরের শুরুতে এ দু'আটি পড়ে আর বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ আমার 'সফরসঙ্গী' এবং আল্লাহ আমার ঘরে আমার 'স্থলবর্তী', তখন মনে কত শক্তি অর্জিত হয়! কত নিশ্চিন্ততা লাভ হয়! বস্তুত পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে এ দু'আ পড়ার পর কষ্টের সফরও আর কষ্টের থাকে না। কষ্টদায়ক কোন দৃশ্য ও পরিস্থিতিও আর সামনে আসে না। মুমিনের সফর হয়ে যায় শান্তির, সফলতার এবং আনন্দের।'

বান্দা যখন বিভিন্ন অবস্থায় দু'আ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলাও তাকে স্মরণ করেন এবং আপন রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করে নেন। ফলে বান্দা এমন নিরাপত্তা লাভ করে, লাইফ জ্যাকেট কিংবা অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারাও যা লাভ হয় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।' (সূরা বাকারা-১৫২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সতর্কতা অবলম্বনের ফলে ভাগ্যের কোন রদবদল ঘটে না, তবে দু'আই উপকার করতে পারে ঘটিত ও ঘটিতব্য সকল বিপদাপদে। বিপদ আপতিত হওয়ার উপক্রম হয় আর দু'আ তার মুখোমুখি হয়। ফলে উভয়টি কিয়ামত পর্যন্ত মুকাবিলার মাঝেই থেকে যায়।' (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২০৪৪)

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করতে অপারগ হয়ো না। কারণ দু'আ করা অবস্থায় কোন ব্যক্তি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যায় না।' (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ১৫৩)

বই নির্বাচনে সতর্ক হোন

দু'আ-দুরূদ এবং অযীফা পাঠ যেহেতু দীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাই যে বই দেখে আমরা উপকৃত হবো তা হতে হবে নির্ভরযোগ্য এবং উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। দু'আ-দুরূদ, অযীফা বিষয়ক অসংখ্য বই বাজারে ছেপে এসেছে। এক্ষেত্রে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সংকলিত বইয়ের তুলনায় সূত্রহীন, মনগড়া, বানোয়াট দু'আ-অযীফা সম্বলিত বইয়ের সংখ্যাই বেশি। মানুষের দীনী আবেগকে সম্বল করে কিছু অসৎ ব্যবসায়ী শুধুই ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির লোভে এসব বই বাজারে ছেড়েছে। অবাক করা ব্যাপার হল, এসব বইয়ের শুরুতে লেখক হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা যায় বিখ্যাত কোন আলেম কিংবা মুহাদ্দিসের নাম। কিন্তু কভার পেজের পর বই খুলতেই প্রকাশ পেয়ে যায় আসল চিত্র। জাল-বানোয়াট বর্ণনায় ঠাসা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। বিজ্ঞদের নাম ব্যবহার করে এরা নির্মম মিথ্যাচার করেছে নবীজীর নামে। যে কথা রাসূল বলেননি, যে কাজ রাসূল শেখাননি, তাই রাসূলের অযীফা নামে চালিয়ে দিয়েছে। একটি প্রসিদ্ধ লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম দু'আ-অযীফা সংক্রান্ত বই দেখতে। একটি বইয়ের গায়ে নাম দেখলাম 'দোয়া ও দুরূদ'। আগ্রহ ভরে তুলে নিলাম। মূল লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে 'ইমাম মুহাম্মদ আল জাওযী' নামটি। অনুবাদ- মাওলানা আব্দুল কাদের, এম.এ ফার্স্ট ক্লাস, ইসলামিক স্টাডিজ। ভিতরের পাতাগুলো দেখছিলাম, বিভিন্ন দু'আ-দুরূদ উল্লেখের পর নামাযের নিয়ত, বিভিন্ন উপলক্ষের নামাযের পদ্ধতি ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরী চাহার শোম্বার ফযীলতের কথাও আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লিখেছে, আখেরী চাহার শোম্বার অর্থ সফর মাসের শেষ বুধবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হইবার পর বুধবার গোসল করত ... মসজিদে নববীতে হাযির হইয়া ইমামতি করেন। এতে সাহাবীগণ অত্যাধিক আনন্দিত হোন। বর্ণিত আছে হযরত আবু বকর খুশিতে ৭ সহস্র দীনার, হযরত উমর ৪ সহস্র দীনার, হযরত উসমান ... আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুসরণের জন্য পৃথিবীময় এ চাহার শোম্বা দিবসটি প্রতি বৎসর উদযাপন করিয়া আসিতেছে...।

পর্যালোচনা

ইমাম মুহাম্মদ আল জাওযী বলে কাকে বোঝানো হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। কেননা এমন নামের কোন ব্যক্তি 'দোয়া দুরূদ' নামের কোন বই আরবীতে লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাস্তবতা হল, কিছু প্রকাশনী দু'আ দুরূদ সম্বলিত যে কোন বইয়ের শুরুতে ইমাম মুহাম্মদ আল জাওযীর নাম মূল লেখক হিসেবে উল্লেখ করে আনন্দ পায়, পুলোকবোধ করে। যেমন হিসনে হাসীনের শুরুতেও তারা মূল লেখক হিসেবে এ নামটি উল্লেখ করেছে। দু'আগ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য এ কথা প্রমাণের জন্য মূলত তারা এ নামটি ব্যবহার করে থাকে। অথচ এ নামের উল্লেখই যে তাদের প্রকাশিত দু'আ-গ্রন্থটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এ কথা তাদেরকে কে বোঝাবে! তারা যে নামটির বিকৃত রূপ বইয়ের শুরুতে উল্লেখ করে তার সঠিক রূপ হল, মুহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জাযারী। (মৃত ৭৩৯ হি.)। এই নামটি থেকে ইবন ফেলে দিয়ে 'জাযারী' শব্দটিকে 'জাওযী' রূপ দিয়ে নতুন একটি নাম জন্ম দিয়েছে। আবিষ্কৃত এ নামটিই দু'আ-দুরূদ সম্পর্কিত যে কোন বইয়ের শুরুতে জুড়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলের নামে মিথ্যাচার বাজারজাত করেছে। না হয় আখেরী চাহার শোম্বার ফযীলত তারা কোত্থেকে আবিষ্কার করল। অতঃপর সাহাবাদের উপর মিথ্যাচার করে সেই আমলকে উম্মতের ধারাবাহিক আমল দাবী করে বসল। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

প্রিয় পাঠক! যেহেতু বাজারে অগ্রহণযোগ্য বইয়ের সয়লাব, তাই সকলের কাছে অনুরোধ, আপনার বইটি সংগ্রহের সময় কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে পরামর্শ করে নিবেন। ভুল দরজায় নক করে নিজের পরকাল বরবাদ করবেন না।

দু'আ-অযীফার নির্ভরযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ

১. আল-হিসনুল হাসীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন। মূল : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাযারী। (মৃত ৭৩৯ হিজরী)

দু'আ ও অযীফার এ গ্রন্থটি ১৫/২০টি প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। আপনার গ্রন্থটি সংগ্রহের আগে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের সাথে পরামর্শ করে নিবেন।

২. মুনাজাতে মাকবূল। মূল : হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ.। মৃত (১৩৬২ হিজরী)

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি সংকলন। এটি ইমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক অনুবাদসহ ছাপানো হয়েছে। প্রতিটি ঘরে ঘরে এ গ্রন্থটি অযীফা হিসেবে পাঠ্য হওয়া উচিত।

৩. মাসনূন দু'আ। মূল : শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক। প্রকাশক : মাকতাবাতুল মানসূর। **(২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

প্রচলিত ওয়াজ মাহফিল : এক্সরে রিপোর্ট

মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান

ইলমে দীন শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরযে আইন। হাদীসে পাকের বর্ণনা অনুযায়ী দীন হল অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি নসীহত তথা হিতাকাঙ্ক্ষার নাম। এই নসীহত ও হিতাকাঙ্ক্ষারই অপর নাম দীনী দাওয়াত বা দীনের পথে আহ্বান। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে দাওয়াতের মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। ওয়ায-মাহফিল বা দীনী মাহফিলের মাধ্যমে সেই নসীহত, হিতাকাঙ্ক্ষা, ও দীনী দাওয়াতের যিম্মাদারীর এক বিরাট অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে আদায় হয়ে থাকে। এ জন্য প্রত্যেক এলাকায় শরয়ীতের সীমারেখা অনুসরণ করে হক্কানী উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে বছরে একাধিক বার দীনী মাহফিলের আয়োজন হওয়া উচিত। এসব মাহফিল উম্মতের জন্য আশাতীত হিদায়াত ও কল্যাণ বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রচলিত ওয়ায-মাহফিল দ্বারা উম্মতের মধ্যে আশানুরূপ দীনী ফায়দা পরিলক্ষিত হয় না। এর মৌলিক কারণ হল, দীনী মাহফিল করার ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ ও সুন্নাত তরীকা অবলম্বনের ঘাটতি। মূলত কোন আমল কবুল হওয়া এবং তার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত হিদায়াত ও ফায়দা লাভের জন্য আমলটি আল্লাহ তা'আলার হুকুম অর্থাৎ মাসআলা অনুযায়ী সুন্নাত তরীকায় সম্পাদিত হওয়া শর্ত। এ শর্তটি অনুপস্থিত থাকলে কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে ওয়ায মাহফিল কেন কোন আমলেরই কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল করা অসম্ভব।

সাধারণত ছ'টি জিনিসের সমন্বয়ে ওয়ায-মাহফিল আয়োজিত হয় - (ক) আয়োজক (খ) আয়োজন (গ) আলোচক (ঘ) আলোচনা (ঙ) শ্রোতা (চ) শ্রবণ। নিম্নে এ ছয়টি বিষয়কে ইসলামী দিকনির্দেশনা ও সুন্নাত তরীকার কষ্টিপাথরে যাচাই করা হল।

(ক) আয়োজক বা ব্যবস্থাপক

ওয়াজ মাহফিলের আয়োজকবৃন্দ তাদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিবেন যে, মূলত আমরা নিজেরাই হিদায়াতের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্যই এ মাহফিলের আয়োজন। পাশাপাশি অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরাও হিদায়াত লাভ করেন এবং সুন্নাত মোতাবেক জীবন গড়তে পারেন এ নিয়তও থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওয়াজ মাহফিল কোন বাৎসরিক উৎসব নয়। কাজেই অমুক মসজিদ অমুক মাদরাসা বা অমুক মহল্লার লোকেরা করে এখন আমরা না করলে কেমন দেখায় বা গত বৎসর করেছি এই বৎসরও তো করতে হয়– এই ভিত্তিতে ও এ ধরণের নিয়তে মাহফিলের আয়োজন করা ঠিক নয়। বর্তমানের অধিকাংশ ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজকবৃন্দ সাধারণত নিম্ন বর্ণিত ভুলগুলো করে থাকেন। (১) ওয়াজ মাহফিলকে তারা বাৎসরিক উৎসব মনে করেন। এজন্য ওয়াজ মাহফিল দ্বারা নিজেদেরকে বা স্থানীয় জনসাধারণকে সুনির্দিষ্ট কোন ফায়দা পৌঁছানো কিংবা সুনির্দিষ্ট কোন ভুলের অবসান ঘটানো তাদের লক্ষ্য হয় না (২) জনসম্মুখে নিজেদের পরিচিতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করা (৩) নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের কোন ফিকির থাকে না। তারা মনে করেন এটা তো অন্যদের সংশোধনের জন্য। ফলে তারা নিজেরা মনোযোগ দিয়ে বয়ান শোনো না, খানাপিনার আয়োজনসহ নানা ধরণের ব্যস্ততায় লিপ্ত থাকেন (৪) কপটতা বা লৌকিকতার সাথে নিজেদেরকে ধার্মিক বা ধর্মপ্রিয় হিসেবে প্রকাশ করা।

এ-ই কারণ যে, ৫/১০টা মাহফিলের আয়োজকের ব্যক্তিজীবনে দীনী পরিবর্তন আসে না। আগেও সে প্রকাশ্য ফাসেক ও বে-আমল ছিল, মাহফিলের পরেও তাই।

(খ) ব্যবস্থাপনা বা আয়োজন

মাহফিলের সভাপতি/ বিশেষ অতিথি/ পরিচালক/ কোন দীনদার পরহেযগার ও খোদাভীরু ব্যক্তিকে বানানো। এ ধরনের ব্যক্তিদের নেক তাওয়াজ্জুহ ও সুদৃষ্টি দ্বারা মাহফিল বরকতময় হয় এবং হিদায়াতের উসিলা হয়। সাধারণত মাহফিলগুলোতে প্রকাশ্য পাপাচারী ও বে-আমল লোককে সভাপতি বা বিশেষ অতিথি বানানো হয়। তাদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে নেককার আল্লাহওয়ালা বান্দাদেরকে অশ্রদ্ধা করা হয় এবং খোদাদ্রোহীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অথচ হাদীসে পাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য পাপাচারী ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে মাহফিল না করা। এতে মানুষকে কষ্ট দেয়া হয় যা শরীয়ত সম্মত নয়। সুতরাং মসজিদে বা খোলা মাঠে/ ময়দানে অনাড়ম্বর পরিবেশে মাহফিলের ব্যবস্থা করা উচিত। (যিকর ও ফিকর; পৃষ্ঠা ১৪০)

মাহফিলের প্রবেশ পথে কোন গেট বা তোরণ না বানানো এবং রঙ-বেরঙের পতাকা না লাগানো। এটা বিজাতীয় অনুকরণ ও অপচয়ের শামিল।

স্টেজে প্রয়োজনাতিরিক্ত লাইট লাগানো বা আলোকসজ্জা না করা। এগুলো অপচয়।

অনুরূপভাবে মাহফিলের নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে দূর দূর পর্যন্ত মাইক না লাগানো। এটা মানুষকে অনর্থক বিরক্ত করা এবং কষ্ট দেয়ার নামান্তর যা বৈধ নয়। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৪২৫)

প্রসঙ্গত: গান-বাজনার আওয়াজে কেউ কষ্ট পেয়ে সমালোচনা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর কুরআন-হাদীসের আওয়াজে কটু মন্তব্য করলে ঈমান চলে যায়। এজন্য কনসার্ট বা থিয়েটারের সাথে মাহফিলের পরিমিত আওয়াজকে তুলনা করা উচিত নয়। অনেকে না বুঝে উভয়টিকে এক করে দেখেন এটা ঠিক নয়।

মাহফিলে বক্তা বা শ্রোতাদের ছবি তোলা, ভিডিও করা গুনাহের কাজ। অনুরূপভাবে প্রজেক্টরের মাধ্যমে পুরুষ বক্তাদেরকে নারীদের সামনে উপস্থাপন করা হারাম। এতে দীনী মাহফিলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বরবাদ হয় এবং বদদীনী ও গোমরাহী বেড়ে যায়। (সহীহ বুখারী ২/৮৮০, সহীহ মুসলিম ২/২০)

মাহফিলের জন্য যার-তার কাছে সাহায্য চাওয়া বা গণচাঁদা উত্তোলন করা একেবারেই অনুচিত। এটা ইসলামের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। মাহফিলের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার আয়োজকবৃন্দ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বহন করবেন। প্রয়োজনে দীনদার ও মুখলিস ব্যক্তিদের কাছে বলা যেতে পারে।

ওয়াজ মাহফিলকে কালেকশন মুক্ত রাখা উচিত। ওয়ায-মাহফিলের দাওয়াত দিয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে চাঁদা কালেকশন করা সমীচীন নয়। কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা কালেকশনের প্রয়োজন হলে আলাদা আয়োজনের মাধ্যমে জনসাধারণদের ডেকে পরামর্শ সভা করে সাহায্যের আবেদন করা। প্রয়োজনে সে পরামর্শ সভায় কালেকশনে পারদর্শী ওয়ায়েযকেও দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। তথাপি ওয়াজ মাহফিলে কোন কালেশন নয়। (সূরা বাকারা- ৪০)

মাহফিল জমানোর জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত না করানো। বরং মাহফিল জমে ওঠার পর কুরআনে কারীমের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে খায়ের ও বরকত এবং মানুষের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করানো উচিত। (সূরা বাকারা- ২)

সর্বসাধারনের জন্য চাঁদা উঠিয়ে গণআপ্যায়নের ব্যবস্থা না করা। এতে লোকদের মনোযোগ বয়ানের চেয়ে খানার দিকে বেশি থাকায় বয়ান দ্বারা আশানুরূপ উপকার হয় না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, ফাতাওয়া শামী ২/১৪০)

যথাসময় ইশার আযান এবং নামায আদায় করে নেয়া। আযানের সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মাইক বন্ধ রাখা। অন্যথায় মাহফিলের মাইকের আওয়াজে আশপাশের মসজিদের মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ফলে নেকি বরবাদ হয়ে গোনাহ লাযেম হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।

রাতের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মাহফিল শেষ করার ব্যবস্থা করা। যাতে সাস্থ্যসম্মত সময়ে ঘুমের প্রয়োজন পুরা করে তাহাজ্জুদ বা কমপক্ষে সহজেই ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সম্ভব হয়। আয়োজকদের এদিকে খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী। বর্তমানে রাত ১/২টা পর্যন্ত মাহফিল চালু রাখার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা থেকে আমাদের সরে আসা উচিত। এতে সওয়াবের তুলনায় গুনাহের ভাগিদার হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ রাত ১/২টায় মাহফিল শেষ করে বাড়িতে ফিরে ২/৩ টার সময় ঘুমাতে গেলে বহু মানুষের ফজরের জামাআত তো দূরের কথা নামাযই কাযা হয়ে যায়, যা মাহফিলের উদ্দেশ্য পরিপন্থী। (সূরা নিসা-১০৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬২৪৫, ৬৩৩৭)

(গ) আলোচক

আল্লাহওয়ালা হক্কানী উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দেয়া। বিশেষ করে যারা ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করে না এমন বক্তাকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করা। ওয়ায-নসীহত করা মূলত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর কাজ। কাজেই ওয়াজ-নসীহত দ্বারা তখনই উম্মতের পুরোপুরি ফায়দা হয় যখন তা নবীগণের তরীকায় করা হয়। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আছে , নবীগণ (আ.) ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তারা একমাত্র আল্লাহ থেকে বিনিময় পাওয়ার আশায় ওয়ায করতেন। (সূরা ইয়াসীন-২১, সূরা শু'আরা-১২৭)

তবে আলোচক মেহমানদের জন্য উন্নতমানের যাতায়াত ও মুনাসিব আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

চুক্তি করে ওয়াযের বিনিময় গ্রহণকারী বা ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ও বে-আমল আলেম এবং টেলিভিশনে প্রোগ্রামকারী কোন আলেমকে বয়ানের জন্য দাওয়াত না দেয়া চাই। কারণ এ ধরনের বক্তার বয়ানের দ্বারা জনগণের মধ্যে দীনের পরিবর্তে কোন কোন ক্ষেত্রে বদদীনী সৃষ্টি হয়। (সূরা বাকারা-৪৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১/৮৪?, শু'আবুল ঈমান লিলবাইহাকী; হা.নং ৯০১৮, ৯০৯৬)

ওয়াজের জন্য বিজ্ঞ আলেমকে দাওয়াত দিতে হবে। কোন জাহেলকে বক্তা বানানো যাবে না, চাই সে যত সুরেলা বয়ানই করুক না কেন। কারণ এটা কিয়ামতের আলামত। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯, ১০০)

ওয়াজ চলাকালীন কোন বক্তা বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে বক্তার বয়ান বন্ধ করে নারায়ে তাকবীর বা অন্য কোন শ্লোগান না দেয়া। কেননা কুরআন-সুন্নাহর আলোচনার মর্যাদা অনেক বেশি, কারো আগমনে তা বন্ধ করার অবকাশ নেই। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী ১১/১৬৭)

বক্তা শ্রোতাদের পূর্বপরিচিত হলে বক্তার নাম ঘোষণা ছাড়াই বয়ান শুরু করা উত্তম। কেননা লোকজনকে ব্যক্তির আকর্ষণে জমায়েত না করে দীনের আকর্ষণে জমায়েত করা উচিত। (মিশকাতুল মাসাবীহ; হা.নং ১৯৩)

বক্তার পরিচিতির খাতিরে নাম ঘোষণা করতে হলে বাস্তব ও স্বাভাবিক পরিচিতি তুলে ধরা, অনর্থক বহুবিধ উপাধি উল্লেখ না করা।

যিনি ওয়াজ করবেন, আলোচনা শুরু করার পূর্বেই তাকে নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। অর্থাৎ তার এই নিয়ত থাকতে হবে যে, আমি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের হিদায়াতের জন্য এবং ওয়ারিসে আম্বিয়ার যিম্মাদারী আদায়ের জন্য বয়ান করছি। কোন পার্থিব স্বার্থে (যেমন: টাকা-পয়সা উপার্জন, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন, মানুষের বাহবা কুড়ানো বা সুরেলা কণ্ঠে সুন্দর আলোচনা করলে আবারো দাওয়াত পাওয়া যাবে) বয়ান করা উচিত নয়। তাছাড়া নিয়ত ঠিক করা কোন কঠিন বিষয় নয়। একজন আলিমে দীন আখেরাতে সুমহান আজর ও সাওয়াবের কথা স্মরণ করলে তার জন্য নিয়ত ঠিক করে নেয়া খুবই সহজ।

(ঘ) আলোচনা

শ্রোতাদের হালফিল সমস্যাবলী এবং তাদের বাস্তব দীনী প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বয়ানের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আম বয়ানের ক্ষেত্রে ঈমান-আমলের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনামূলক আলোচনার পাশাপাশি পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য একজন মানুষকে যে পাঁচটি বিষয়ের পাবন্দি করতে হয় সেগুলোও সবিস্তারে আলোচনা করা যথা: (১) আকাইদ দুরস্ত করা, (২) ইবাদত-বন্দেগী মাসআলা অনুযায়ী সুন্নাত তরীকায় সম্পাদন করা, (৩) রিযিক হালাল রাখা (৪) ইসলামী সামাজিকতা জেনে সে অনুযায়ী সকলের হক আদায় করা (৫) অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। তবে এগুলোর মধ্য থেকে মাহফিল এলাকার লোকজনের জন্য যেগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করণীয় বা বর্জনীয় তা বিশেষভাবে তুলে ধরা। প্রয়োজনে বক্তাগণের মধ্যে ওয়াযের বিষয়বস্তু বণ্টন করে দেয়া ভালো। (সূরা বাকারা-১৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯)

মাহফিলের মধ্যে বেশি বেশি সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত আলোচনা করা এবং নামাযসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করা। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭৭)

ওয়াযের মধ্যে ভিত্তিহীন কিস্সা-কাহিনী বলে শ্রোতাদের হাসানো বা কাঁদানোর কোন ফায়দা নেই। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫০৫)

অনেক বক্তা চা পানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কালিমা বা দুরূদ শরীফ নিজে শুরু করে শ্রোতাদের দায়িত্বে দিয়ে দেন। তারপর এ সুযোগে তিনি চা পান করেন। এটা দৃষ্টিকটু কাজ। **(৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

মাতৃজাতি

স্ত্রীর অধিকার ও স্বামীর কর্তব্য

মুফতী হেদায়াতুল্লাহ

মানুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, ঘরে-সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্ত্রী সর্বদা নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

অর্থ : স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরূপ। (সূরা বাকারা-১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বদা লেগে থাকার। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীদের প্রেমাষ্পদ হিসেবে, স্বামীদের শান্তি অর্জনের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لم ير للمتحابين مثل النكاح.

অর্থ : বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার অনুরূপ আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৪৭)

তিনি আরো বলেন, মুমিন ব্যক্তি তাকওয়া অর্জনের পর উত্তম বিবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস অর্জন করতে পারে না। (প্রাগুক্ত; হা.নং ১৮৫৭)

স্ত্রী হল স্বামীর অর্ধেক দীন-ধর্ম সংরক্ষণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দীনদারী পূর্ণ করে নিল। অতএব সে যেন বাকিটুকুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৫১০০)

যে স্ত্রী তার জীবন-যৌবন উজাড় করে, রূপ-লাবণ্য বিলীন করে, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বিসর্জন দিয়ে অপরিচিত একজন পুরুষের শুধু 'কবুল' কথায় আস্থা রেখে এতকিছু করলো, স্বামীর জীবনে এত কল্যাণ আর এত সুখ-সম্ভার বয়ে আনলো, তার জন্য স্বামীর কী করণীয় তা জানা ও সে অনুযায়ী কর্তব্য পালন করা স্বামীর জন্য জরুরী। ইসলাম স্ত্রীকে এমন কতগুলো অধিকার দিয়েছে যদি স্বামীরা সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে উভয়ের জীবন হবে আরো সুখকর ও শান্তিময়। ইসলাম নির্দেশিত স্বামীর কর্তব্য ও স্ত্রীর অধিকারগুলো নিম্নরূপ।

১. ভরণ-পোষণের দায়িত্ব : ইসলাম স্বামীকে হালাল অর্থ দ্বারা সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দিয়েছে। শরীয়তের কোথাও স্ত্রীকে চাকুরী করা বা অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ : স্বামীর জন্য আবশ্যক হল, ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। (সূরা বাকারা-২৩৩)

তাছাড়া কেউ কারো সেবায় নিয়োজিত থাকলে তার সর্ববিধ খরচাদি সেবা গ্রহণকারীর উপরই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং স্ত্রীর বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। আরাফার ময়দানে বিদায়ী ভাষণে এবং জীবনের অন্তিম সময় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল, আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তখনো তিনি বলেছিলেন,

الله الله فى النساء فإنهن عوان فى أيديكم.

অর্থ : স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তারা তোমাদের হাতে আবদ্ধ। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২০৬৯৫)

সাহাবী হযরত মু'আবিয়া ইবনে হায়দা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতি আমাদের স্ত্রীদের কী কী অধিকার রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে, যখন তোমরা পরিধান করবে তাদেরকেও পরতে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪২)

এজন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়া, তার হাত খরচের জন্য পৃথকভাবে কিছু অর্থ দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। যাতে ছোট ছোট প্রয়োজন যা সর্বদা বলা সম্ভব নয় স্ত্রী যেন নিজেই তা পূর্ণ করতে পারে এবং আল্লাহর রাস্তায় কিছু কিছু খরচ করতে পারে। শুধু এতটুকু নয়; শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকরানী ও সেবিকার ব্যবস্থা করাও জরুরী। অবশ্য স্বামী স্বচ্ছল না হলে রান্না-বান্নার কাজ তখন স্ত্রীর দায়িত্বে এসে যায়। কিন্তু স্ত্রী যদি রুগ্নতার কারণে অথবা বড় ঘরের কন্যা হওয়ার কারণে নিজে কাজ করতে সক্ষম না হয় তবে স্বামীর দায়িত্ব হল, প্রস্তুতকৃত খাবার ক্রয় করা অথবা অন্য কারো মাধ্যমে রান্নার ব্যবস্থা করা। আর পোশাকাদীর ক্ষেত্রেও শরীয়তের সীমা-রেখা ও স্বামীর সামর্থের মধ্যে থেকে স্ত্রীর রুচি পছন্দের খেয়াল করা জরুরী। অনেকে স্ত্রীর রুচি ও পছন্দকে গুরুত্ব না দেয়াকে অতি দীনদারী মনে করে, যা মোটেও ঠিক নয়।

২. বসবাসের ব্যবস্থা : বসবাসের জন্য স্ত্রীকে প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক ঘর অথবা পৃথক কামরা দেয়া জরুরী, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে সময় যাপন করতে পারে এবং নিজের মালামাল হেফাযত করতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে একত্রে থাকতে না চায় তাহলে তাকে পৃথক রাখা স্বামীর কর্তব্য। আর চুলার আগুন পৃথক করা তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে পুত্রবধূগণ স্বেচ্ছায় তা করলে বহুগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। মূলত স্বামীর মাতা-পিতার খিদমত করা স্বামীর দায়িত্ব। সে নিজে করবে অথবা অন্য লোক দিয়ে করাবে। বর্তমান সমাজে অনেক স্বামী জোরপূর্বক স্ত্রীকে মাতা-পিতার শাসনাধীন রাখে। তাদের সেবা করতে বাধ্য করে। ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে একান্নভুক্ত থাকা সওয়াবের কাজ ও গৌরব জ্ঞান করে, যা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও জুলুম। শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার করণীয় হল, পুত্র ও পুত্রবধূকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেয়া। স্বেচ্ছায় তারা যতটুকু সেবা করে ততটুকুতে খুশি থাকা এবং সে জন্যে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। পুত্রবধূ

ঘরে এলে সংসারের যাবতীয় কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে 'রিটায়ার্ড পার্সন' মনে করা সঠিক কাজ নয়। এক্ষেত্রে শাশুড়ীগণ সে সময়টি স্মরণ করতে পারেন যখন তিনিও এই বয়সে কারও ঘরে পুত্রবধূ হয়ে এসেছিলেন।

৩. মহর আদায় করা : মহর মূলত একটি সম্মানী যা দ্বারা স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী মহর নির্ধারণ করা সবচেয়ে উত্তম। যতটুকু মহর নির্ধারণ করা হবে তা পরিপূর্ণ আদায় করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থ : স্ত্রীদেরকে তাদের মহর যথাযথভাবে আদায় করে দাও। (সূরা নিসা-৪)

স্ত্রীর লাজুকতা বা অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিংবা চাপ প্রয়োগ করে কখনোই স্ত্রীকে মহরের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়।

৪. স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার : স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তার সাথে নম্র আচরণ করা এবং তাকে খুশি রাখা স্বামীর কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থ : তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। (সূরা নিসা-১৯)

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم.

অর্থ : মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬২)

এ ধরনের আরো বহু বর্ণনা হাদীসগ্রন্থে রয়েছে যেখানে স্ত্রীর কাছে ভালো হওয়া পুরুষের জন্য প্রকৃতার্থে ভালো হওয়ার মানদণ্ড নির্ণয় করা হয়েছে। কারণ স্বামীর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ববিষয় অন্যের কাছে গোপন থাকলেও স্ত্রীর কাছে তা স্পষ্ট থাকে। তাই স্বামী বাস্তবে ভালো না হলে অন্যের দৃষ্টিতে যত ভালোই হোক স্ত্রীর কাছ থেকে ভালো হওয়ার সার্টিফিকেট কখনোই পাবে না।

অনেকে বাইরে বেজায় ভদ্রলোক, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভদ্রতার কোন তোয়াক্কা করে না। সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে, গালমন্দ করে, আবার অনেকে তাদের গায়ে হাত তোলে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করে বলেন,

لاتضربوا إماء الله.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করো না। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন কোন বিবি কিংবা চাকর-নওকরকে প্রহার করেননি। আর যারা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে তাদেরকে অভদ্র বলেছেন। স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শরীয়তে স্বামীকে হালকা প্রহারের অনুমতি দেয়া হলেও ভদ্র শ্রেণীর কাছ থেকে সেটা কাম্য নয় বলা হয়েছে।

৫. স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন : প্রয়োজন অনুযায়ী স্ত্রীর জৈবিক ও দৈহিক চাহিদা পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব। প্রতি চার মাসে অন্তত একবার স্ত্রীর সাথে দৈহিক মেলামেশা করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। স্বামী যদি তার হক আদায় না করে আর স্ত্রী কোন গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে তার জন্য দায়ী হবে স্বামী এবং এর জন্য পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সমাজের বহু মানুষ বিয়ে করে স্ত্রীকে শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত আর ঘর পাহারা দেয়ার জন্য রেখে বিদেশে চলে যায়। বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে সাক্ষাত হয় না। স্বামী বিদেশে কীভাবে দিন কাটাচ্ছে এবং স্ত্রী দেশে কী দুঃসহ রাত-দিন যাপন করছে তা নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি পাওয়া গেলে তো কথাই নেই, তার মুখে চুনকালি দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়। চিন্তা করে দেখুন, স্ত্রীর প্রতি এটা কত বড় জুলুম! শরীয়ত তো শুধুমাত্র শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত আর ঘর পাহারা দেয়াকে স্ত্রীর কাজ নির্ধারণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা স্বামীদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ.

অর্থ : বিবিদেরকে বসবাস করাও যেখানে তোমরা বসবাস কর। (সূরা তালাক-৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা স্ত্রীদের পোশাক স্বরূপ আর স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক স্বরূপ। আজ স্বামী কর্তৃক সেই পোশাক খুলে ফেলার কারণে, তার হক আদায় না করার কারণে স্ত্রীরা অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ছে। এ কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রী অপরাধী হলেও মূল অন্যায়টা স্বামীর। কেননা স্বামীর শরয়ী বিধান লঙ্ঘনের দরুণই স্ত্রীর পক্ষ হতে সীমালঙ্ঘনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই ইসলামের ফায়সালা হল, স্বামী হয়তো বিয়ের আগে প্রবাস জীবন কাটাবে অথবা চার মাস পরপর বিবির সান্নিধ্যে চলে আসবে অথবা বিবিকে সাথে নিয়ে বিদেশে সফর করবে।

৬. স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান : স্বামীর কাছে স্ত্রীর যেমন জৈবিক অধিকার রয়েছে তেমনি ধর্মীয় অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম-৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته.

অর্থ : পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার, তাকে তার পরিবারের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২০০)

তাই বিবাহ ইচ্ছুক প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য হল, দীনদার নারী বিবাহ করা। তাহলে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দীনের উপর চলবে। আর যদি অশিক্ষিত বা জেনারেল শিক্ষিত নারী বিবাহ করা হয় তাহলে তাকে নামায-রোযা, ইবাদত-বন্দেগীর মাসআলা-মাসাইল, হায়েয-নিফাস প্রভৃতির বিধান, বিদ'আত ও রুসূমাত পরিহার করা ইত্যাদি বিষয়ক ইলম শিক্ষা দেয়া স্বামীর জন্য আবশ্যক। অন্যথায় দুনিয়াতে চরম অশান্তি সৃষ্টি হবে আর পরকালেও ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

৭. স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয় : অনেকে স্ত্রীর চারিত্রিক বিষয়ে অহেতুক সন্দেহ করে, তার প্রতি মন্দ ধারণা রাখে। এটা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

অর্থ : কিছু কিছু ধারণা সরাসরি গুনাহ। (সূরা হুজুরাত-১২)

এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় হল, বিবাহের পূর্বে সর্ববিষয়ে সাধ্যানুযায়ী যাচাই-বাছাই করা। বিবাহের পরে স্পষ্ট দলীল ব্যতীত স্ত্রীর প্রতি কোন মন্দ ধারণা না করা। বরং নিজের জীবনের অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা। আর এই বিশ্বাস রাখা যে, যে বিবি আমার জন্য উপযুক্ত ও কল্যাণকর আল্লাহ তা'আলা আমার

জন্য তাকেই বরাদ্দ করেছেন। অতএব আমি তাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবো। কারণ সূরা নূরে এসেছে,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ.

অর্থ : মন্দ নারীগণ মন্দ পুরুষদের জন্য আর মন্দ পুরুষগণ মন্দ নারীদের জন্য, উত্তম নারীগণ উত্তম পুরুষদের জন্য আর উত্তম পুরুষগণ উত্তম নারীদের জন্য। (সূরা নূর-২৬)

অতএব আশা করা যায়, আমি যদি সৎচরিত্রের অধিকারী হই তবে আমার স্ত্রীও চরিত্রবতী হবে। অনেকে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলনের গোপনীয় বিষয় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রকাশ করে দেয়, এটা মারাত্মক গুনাহের কাজ এবং স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার শামিল। এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

৮. স্ত্রীর মান-অভিমান : ইসলাম স্বামীর সাথে স্ত্রীর মান-অভিমানের অধিকার দিয়েছে। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের তনুদেহ ভিন্ন তাই একজনের সর্ববিষয় অপরজনের কাছে ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। উপরন্তু নারীদের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته.

অর্থ : হে পুরুষগণ! তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কল্যাণের অসিয়ত গ্রহণ কর। নিশ্চয় তাদেরকে পাঁজরের বক্র হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তুমি তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে যাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১৮৬)

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম বলে অবহিত করেছেন। তাই পুরুষদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে হবে। স্ত্রীদের বক্রতা আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য্য মনে করতে হবে। তাদের মান-অভিমান সয়ে যেতে হবে। হাদীসে রাসূলের সাথে বিবিদের অনেক মান-অভিমানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেমন একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে রাসূলের জন্য একটা বাটিতে কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। এদিকে আয়েশা রাযি. এর ঘরে অন্য স্ত্রীর হাদিয়া পাঠানোতে তাঁর অভিমান হল। তাই আয়েশা রাযি. খাবারের পাত্রটি ভেঙ্গে ফেললেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে ক্ষিপ্ত হলেন না; বরং পড়ে যাওয়া খাবারগুলো নিজ হাতে একত্রিত করলেন এবং সেই পাত্রের পরিবর্তে আরেকটি পাত্র দিয়ে খাদেমকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের মায়ের অভিমান হয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২২৫)

এ ধরনের বহু ঘটনা রাসূলের জীবনে ঘটেছে যা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী।

৯. স্ত্রী যখন অভদ্র, বদমেযাজী : স্ত্রী অভদ্র ও বদমেযাজী হলেও ইসলাম স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছে এবং প্রতিদান হিসেবে পরকালে স্বামীর জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। স্ত্রীর ভালো দিকগুলো নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করতে বলেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বলেছে। কারণ অভদ্র হওয়া সত্ত্বেও সে তো স্বামীর খিদমত, রান্না-বান্না, সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদি লালন-পালনসহ প্রতিনিয়ত অসংখ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অতএব কদাচিৎ তার পক্ষ থেকে কিছুটা কষ্ট পেলে তা সয়ে যাওয়াই স্বামীর কর্তব্য। এক্ষেত্রে লোকমান হাকীমের একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, লোকমান হাকীম একজন কৃতদাস ছিলেন। একবার তার মুনীব তাকে ভালোবেসে তার জন্য বড় একটি লাল বাঙ্গি নিজ হাতে কাটলেন। তারপর বাঙ্গির টুকরোগুলো তার মুখে তুলে দিচ্ছিলেন। লোকমান হাকীম আনন্দচিত্তে খেয়ে চলছিলেন। মুনীব শেষ টুকরোটি হাতে নিয়ে বললেন, সবগুলো তোমাকে খাওয়ালাম; এটি আমি খাই। তিনি টুকরোটি মুখে নিয়ে সাথে সাথে ফেলে দিলেন। বললেন, বাঙ্গিটি দেখতে এত ভালো অথচ ভেতরে এমন তিতা! তুমি খেলে কিভাবে? লোকমান হাকীম উত্তর দিলেন, আপনার এই হাত থেকে জীবনে কত নেয়ামত লাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ না হয় একটু কষ্টই পেয়েছি, তাই বলে তা ফিরিয়ে দেই কিভাবে?

এই ছিল বুযুর্গ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা। ঠিক স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টের দিকে না তাকিয়ে তাদের দ্বারা অর্জিত সুখের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। তবেই কষ্ট ফুরিয়ে যাবে।

১০. স্ত্রী সুন্দরী নয় বা অপছন্দনীয় : কারো স্ত্রী অসুন্দর, বেঁটে বা অপছন্দনীয় হলে এসব কারণে যদি পরনারীর প্রতি মন আকৃষ্ট হয় তাহলে ভাবা উচিত যে, আমার পাপের কারণে হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এই স্ত্রী বরাদ্দ করেছেন। আর সে তার নেক আমলের কারণে আমার মত সুদর্শন স্বামী পেয়েছে। তাহলে আমি হলাম তার নেক আমলের প্রতিদান আর সে হল আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তাছাড়া সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি দোষ-গুণ আল্লাহ তাআলার দান। তাতে স্ত্রীর কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যদি তার স্থানে আমাকে সৃষ্টি করতেন তখন আমারই বা কি করার ছিল! বা এখনো যদি আমার সৌন্দর্য্য কেড়ে নেন, বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু করে দেন তাহলে আমার কি করার থাকবে? তাই এখানেও ধৈর্য্য ধারণ করা জরুরী। পরস্ত্রীর প্রতি মন আকৃষ্ট হলে ইসলামের নির্দেশ হলো নিজ স্ত্রী নিয়ে মশগুল হয়ে যাওয়া। কারণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে,

فان معها مثل الذي معها.

অর্থ : উক্ত নারীর সাথে যা আছে নিজ স্ত্রীর মাঝেও তাই আছে। অতএব পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। (সুনানে দারিমী; হা.নং ২৩৮৮)

মনে রাখতে হবে, একটি মেয়ে তার বাবা-মা, ভাই-বোন সকলকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এখন স্বামীই তার একমাত্র আপন। সে স্বামীই যদি তার দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার জীবনে সুখ পাওয়ার আশা আর কার কাছ থেকে করবে!

১১. স্ত্রী নিঃসন্তান বা কন্যা সন্তান প্রসবিনী : স্ত্রীর গর্ভে সন্তান না হলে অথবা কেবল কন্যা সন্তান হলে অনেকেই স্ত্রীকে দোষারোপ করে। অথচ পুত্র বা কন্যা সন্তান দান করা স্ত্রীর আয়ত্তাধীন নয়; বরং সেটা একমাত্র আল্লাহরই দান। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ.

অর্থ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (সূরা শূরা-৪৯)

উপরন্তু ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে স্বামীর; স্ত্রীর নয়। তাহলে তার প্রতি এই জুলুম কেন? তাই আল্লাহ যা দান করেন কন্যা হোক বা পুত্র, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা চাই। স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা নির্যাতন করা অন্যায়। এক্ষেত্রে দু'আ করা যেতে পারে, হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি যে নেক সন্তানের সিদ্ধান্ত করেছ তা আমাকে তুমি দান কর।

১২. একাধিক বিবাহ : ইসলামের দৃষ্টিতে একাধিক বিবাহ নারীর প্রতি জুলুম করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং নারীর অভিভাবকত্ব প্রদান ও তার হক আদায়ের জন্য এ

ব্যবস্থা। নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি হওয়ায় ভরণ-পোষণের সামর্থ্য ও তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শর্তে ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। উল্লিখিত শর্ত কারো মাঝে বিদ্যমান না থাকলে কেবল এক বিবি নিয়ে জীবন যাপন করতে বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করে আর স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সতর্ক করে বলেন,

إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط.

অর্থ : যদি কারো দুজন বিবি থাকে আর সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা না করে তবে কিয়ামতের দিন সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ তার এক কাঁধ একদিকে ঝুঁকে থাকবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৪১)

বর্তমান সমাজে যাদের একাধিক বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, যারা ইনসাফ বলতে কিছুই বোঝে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই একাধিক বিবাহ করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আর ইসলামের শত্রুরা তাকে দলীল বানিয়ে বলে বেড়ায়– ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে নারীদের প্রতি জুলুম করেছে। এজন্য একাধিক বিবাহের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। সামর্থ্যবান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ীদের যেমন একাধিক বিবাহের মাধ্যমে নারীদের অভিভাবকত্ব গ্রহণের প্রতি এগিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে তেমনি সামর্থ্যহীন ও বে-ইনসাফগারদের ও তা থেকে সর্বোতভাবে বিরত থাকতে হবে।

১৩. তালাক প্রসঙ্গ : স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপন করতে না চায় তখন তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইসলাম কয়েকটি কার্যকরী নীতিমালা প্রয়োগের আদেশ করেছে। সেসব ধারা অতিক্রম ব্যতীত তাকে তালাক দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

অর্থ : তোমরা যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্য হওয়ার আশঙ্কা কর তাদেরকে উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে (শর্ত সাপেক্ষে) শাসন কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করো না। (সূরা নিসা-৩৪)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন- (১) উপদেশের মাধ্যমে বুঝিয়ে সংশোধন করা, (২) প্রয়োজনে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যে তার সাথে শয্যা ত্যাগ করা, (৩) প্রয়োজনে পূর্বে উল্লিখিত পন্থায় দৈহিক হালকা শাসন করা। তারপরেও যদি সংশোধন না হয় তবে স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকে দুজন সালিস (তৃতীয় পক্ষ) নির্ধারণ করে তাদের মাধ্যমে সমঝোতা করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। যদি তারপরও পরস্পরে সমঝোতা না হয়; সমাধানের চারোটি পন্থাই ব্যর্থ হয় তাহলে বিজ্ঞ কোন আলেম বা মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে এক তালাক প্রদান করা। তারপরও যদি সঠিক পথে না আসে তাহলে পুনরায় দ্বিতীয় তালাক, তারপর না হলে সেই পর্যায়ক্রমে তৃতীয় তালাক প্রদান করা। উপরোক্ত ধাপসমূহ পার হওয়ার পূর্বে কোন অবস্থায়ই স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়। অথচ বর্তমানে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলোর কোনই তোয়াক্কা করা হয় না। কথা কাটাকাটি আর ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তালাক দেয়া হয় বা শরঈ প্রয়োজন ও যোগ্যতা ছাড়া শুধু প্রথম স্ত্রীর প্রতি রাগ মিটানোর জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া শুরু করে, এ সবই অপরিপক্ক অবলা নারীর প্রতি জুলুম ও অন্যায়।

সত্য বলতে কি, সমাজের অধিকাংশ নারী-পুরুষই বর্তমানে ইসলামের পারিবারিক নীতি সম্পর্কে অনবগত থাকে। ফলে সাধারণ লোক তো বটেই বাহ্যিকভাবে দীনদার এমন কিছু লোকও নিজের অজান্তেই স্ত্রী ও পরিবারের অধিকারের প্রতি চরম উদাসীন বা জুলুমবাজ। কাজেই পারিবারিক জীবনে তারা সুখের পরিবর্তে দুঃখ-কষ্ট আর বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়। যদি বিবাহ ইচ্ছুক প্রত্যেক নারী-পুরুষ বিবাহের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, সন্তানাদির অধিকার, শ্বশুর-শাশুড়ী ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে অবগত হতো তবে তাদের পারিবারিক সমস্যা বহুলাংশেই কেটে যেতো। বিজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন যে, এক সময় মালয়েশিয়ায় শতকরা ৭০ ভাগ বিবাহই ভেঙ্গে যেত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতো। কিন্তু ড. মুহাম্মদ মাহাথির সাহেব যখন আইন প্রণয়ন ও জারি করলেন যে, 'দেশের সকল বিবাহ ইচ্ছুকদেরকে বিবাহের পূর্বে একমাস ছুটি দেয়া হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী পারিবারিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে হবে, এরপর বিবাহের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।' তখন থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে তা নেমে শতকরা ৭ ভাগে এসে ঠেকেছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এ মুসলিম দেশেও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাধ্যতামূলক এমন কোন প্রশিক্ষণ কোর্স বিজ্ঞ ও হক্কানী উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে চালু করা হলে নিশ্চয় দেশবাসী অনেক অশান্তি থেকে মুক্তি পেতো। তবে এটা সহজসাধ্য কাজ নয়। এজন্য এ ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবাই যদি এসব বিষয়ে সচেতন হই এবং অন্তত বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কর্তৃক বাংলায় রচিত পুস্তক থেকে ইসলামী পারিবারিক জীবন ও নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়াদি ভালোভাবে অধ্যয়ন করি তাহলেও অনেকটা লক্ষ্য অর্জন হতে পারে। এক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. রচিত *ইসলামী পারিবারিক জীবন*, বাংলার বিদগ্ধ আলেমে দীন শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. রচিত *ইসলামী বিবাহ* নামক কিতাব দু'টি নিয়মিত অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ মুহাম্মাদিয়া কড়াইল, টি অ্যান্ড টি কলোনী, বনানী, ঢাকা

(৪৬নং পৃষ্ঠার পর; দিয়ানতদার ছাত্রের জন্য...)

আর যদি মনে কর যে, না, আমি এ প্রতিষ্ঠানে যতদিন আছি আমার মালিকানায় কোন মোবাইল রাখব না! বাড়িতেও না, রাস্তা-ঘাটেও না, মাদরাসায় তো না-ই– দেখবে এতে তোমার উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হবে না। বর্তমানে সবখানেই নাগালের মধ্যে মোবাইল সুবিধা রয়েছে। তুমি রাস্তা-ঘাটের বিপদ-আপদ, সুবিধা-অসুবিধা সবকিছু সহজেই বাড়িতে জানিয়ে দিতে পারবে। বাড়িতে গেলেও সকল প্রয়োজন অন্যের মোবাইলে পূর্ণ করতে পারবে। তাহলে বলো, আর কোন্ প্রয়োজনে তুমি একটা মোবাইল পালবে!

সুতরাং এখনই প্রতিজ্ঞা করে নাও, তুমি তালেবে ইলমির যামানায় এ প্রতিষ্ঠানে, রাস্তা-ঘাটে, বাসা-বাড়িতে তোমার মালিকানায় রেখে মোবাইল ব্যবহার করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

অনুলিখন : মাওলানা মাহমূদুল হাসান খুলনাবী, শিক্ষক : মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বছিলা, ঢাকা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ইবাদাত

মাওলানা আব্দুল্লাহ
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা

১২৩ প্রশ্ন : আমাদের দেশে ইমাম সাহেবের নামাযে ভুল হলে মুক্তাদীগণ 'আল্লাহু আকবার' বলে লুকমা দিয়ে থাকেন। অথচ হাদীসে এসেছে, التسبيح للرجال (পুরুষগণ سبحان الله বলে লুকমা দিবেন) তাহলে 'আল্লাহু আকবার' বলে লুকমা দেয়ার ভিত্তি কি? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উল্লেখ্য, আমরা সংবাদ পেয়েছি মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. 'আল্লাহু আকবার' বলে লুকমা দেয়ার প্রচলনটি গলত বলেছেন।

উত্তর : নামাযে ইমাম সাহেবের কোন ভুল হয়ে গেলে মুক্তাদীগণ سبحان الله বলে লুকমা দিবে। এটিই সঠিক নিয়ম। হাদীস ও ফিকহের কিতাবসমূহ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। الله اكبر বলে লুকমা দেয়ার কথা বর্ণিত নেই। এর স্পষ্ট কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও যেহেতু নামাযে উঠতে বসতে الله اكبر বলতে হয় এর থেকে ধারণা করে মুক্তাদী যদি ইমাম সাহেবের কোন ভুল হলে الله اكبر বলে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহলে তাতে কারো নামায ভাঙবে না বা কোন ক্ষতি হবে না। কারণ তাকবীর নামাযেরই একটি অংশ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১২০৩, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৬, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৬৯, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২৮১৭, ২৩৭৬২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ১২৫, সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী; হা.নং ৫৬১, মু'জামুল কাবীর লিত-ত্ববারানী; হা.নং ৫৭৩৯, উমদাতুল কারী ৭/২৭৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৯৯, আল-বাহরুর রায়িক ২/১২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১১/৪১, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/৬২)

মুহাম্মদ ইনামুল হক
পাঁচানী গৌরিপুর, কুমিল্লা

১২৪ প্রশ্ন : আমাদের সমাজে মাইয়িতকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কাজ হয়ে থাকে। শরীয়তের আলোকে এগুলোর বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

(ক) জানাযার সময় গোলাপজল ছিটানো হয়। দাফনের পর কবরের চার কোণায় চারজন চার কুল পড়ে রসুন পুতে রাখে। এরপর কবরের উপর বরই গাছের শাখা পুতে রাখা হয়।

(খ) মাইয়িতকে কিবলামুখী না করে আকাশমুখী করে শোয়ানো এবং শুধু চেহারাটা কিবলামুখী করে দেয়া হয়।

উত্তর : (ক) মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নাতের আদর্শ বিদ্যমান। কোন ক্ষেত্রে এতোটুকু শূন্যতা নেই যেখানে মনগড়া কিছুর প্রয়োজন আছে। কাজেই আমাদের সকল আচরণে সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে সুন্নাহ বর্জিত হলে সে স্থান বিদ'আত ও বিজাতীয় কুসংস্কারের দখলে চলে যায়। প্রশ্নোক্ত প্রথাগুলোও বিদ'আত ও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, তথা জানাযার সময় গোলাপজল ছিটানো, মাইয়িতকে দাফনের পর কবরের চার কোণায় চারজন চার কুল পড়ে রসুন অথবা পাথর বা মাটির ঢিলা রাখা এবং খেজুরের ডালা বা বরই গাছের শাখা গেড়ে দেয়া ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। তবে দাফনের পরই কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহূন পর্যন্ত, আরেকজন পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করা প্রমাণিত আছে। তেমনিভাবে দাফনের পর দিন-তারিখ তথা তিনদিনা, চল্লিশা ইত্যাদি না করে এবং ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে নয়, নিজেদের যার যতটুকু সামর্থ হয় কুরআন তিলাওয়াত যিকির ও দুরূদের মাধ্যমে ঈসালে সওয়াব করার সুযোগ আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭১৮, আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্ববারানী; হা.নং ৪৯১, আহকামে মাইয়িত [আব্দুল হাই আরিফী]; পৃষ্ঠা ২৩৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫/৪১৫, ইনআমুল বারী ৪/৫২৯, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী আলা মারাকিল ফালাহ ১/৬০৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/২৮৯, নিযামুল ফাতাওয়া ২/১৮৭)

(খ) মাইয়িতকে কবরে রাখার সুন্নাত তরীকা হল, মাথা উত্তরে পা দক্ষিণে শরীর সম্পূর্ণ ডান কাতে রেখে চেহারা পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দেয়া। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি মাইয়িতকে আকাশমুখী করে শোয়ানোর পর শুধু চেহারাকে কিবলামুখী করে দিলে সে সুন্নাত আদায় হবে না। তাই তা পরিহার করে সুন্নাত তরীকায় দাফন করার প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী এবং এর জন্য সুন্নাত তরীকায় কবর খননের বিষয়টিও বিজ্ঞ আলেমগণের কাছ থেকে সরাসরি শিখে নিতে হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৭১৮, আদদুররুল মুখতার ২/২৩৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/১৪৮)

মুহাম্মদ ইমরান মাহমূদ
দক্ষিণ মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা

১২৫ প্রশ্ন : (ক) মসজিদে কেউ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলে তা শ্রবণ করা ওয়াজিব কিনা? যদি এ সময় আমার ফরয নামায, নফল নামায, যিকির, কিতাব পড়া ইত্যাদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি কী করব?

(খ) ফজরের পর ইমাম সাহেব সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত সবাইকে পড়ান। এ সময় অন্য তাসবীহ, ইস্তিগফার পড়া ঠিক হবে কিনা?

(গ) হিফয মাদরাসার ছাত্রদের সবক শোনা উস্তাদদের জন্য ওয়াজিব। এ সময় অন্য কথা বলা যাবে কিনা?

(ঘ) গত ০৯-০৩-২০১৫ ইং তারিখে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার বার্ষিক মাহফিলের আগে মাইকে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। রাস্তা ও বাড়ির সবার শোনা ওয়াজিব ছিল কিনা?

উত্তর : (ক) মসজিদে কোন ব্যক্তিগত আমল এমন উচ্চস্বরে করা যাবে না যাতে ব্যক্তিগত আমলে লিপ্ত অন্যদের কষ্ট হয়। আর নামাযের নির্ধারিত সময়ে ও তার আগে বা পরের সুন্নাতে মুআক্কাদার সময়ে নামায ছাড়া অন্য কোন সম্মিলিত আমলও সশব্দে করা যাবে না।

হ্যাঁ, জামা'আত ও সুন্নাতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে শরীয়ত সমর্থিত সম্মিলিত আমল প্রয়োজন পরিমাণ আওয়াজে করা যাবে। এতে ব্যক্তিগত আমলকারীর কষ্ট হলে তিনি নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে করবেন। আর সম্মিলিত দীনী কাজ কিংবা কারো ব্যক্তিগত বৈধ আমলে বিঘ্ন না ঘটানোর শর্তে সশব্দে ব্যক্তিগত আমল করা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে আমলে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য অন্যের সশব্দে তিলাওয়াত শোনা কখনো জরুরী নয়।

(সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ১৩৩২, ফাতাওয়া শামী ১/৫৪৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৭, আল-বাহরুর রায়িক ১/৬০০, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলাদদুর ১/২৩৭, বায়ানুল কুরআন [থানবী রহ.] ২/৭৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭/১৬১)

(খ) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের তিলাওয়াত করা সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ন্যায় ব্যক্তিগত ও নিঃশব্দে করার আমল। মুসল্লীদের শেখানোর জন্য অল্প কিছুদিন সশব্দে এগুলোর মশক করানো জায়েয।

পক্ষান্তরে এর কোন একটি উদাহরণত সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের স্থায়ী মশকের নিয়ম বানানো জায়েয নেই। আর কোন সূরা বা আয়াতের মশকের সময় সকলের শুনতে হবে এমনটা জরুরী নয়। কেউ ব্যক্তিগতভাবে অন্য আমলও করতে পারবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৬, ৩৬৭, ফাতাওয়া শামী ১/৫৪৬, আল-বাহরুর রায়িক ১/৬০০, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলাদদুর ১/২৩৭)

(গ) হিফয বিভাগের ছাত্ররা যখন উস্তাদকে পড়া শুনায়, তখন তাদের তিলাওয়াত শুনা ওয়াজিব। কারণ তখন না শুনলে তা'লীমের হক আদায় হবে না। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা বা অন্য কাজে মনযোগী হওয়া নাজায়েয।

আর যখন ছাত্ররা ব্যক্তিগত পড়া মুখস্থ করে তখন পড়া শ্রবণ করা ওয়াজিব নয়। এ সময়ে কথা বলা বা অন্য কাজ করা জায়েয আছে। (সূরা মায়িদা-১, সূরা নিসা-৫৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৪)

(ঘ) প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় রাস্তা ও বাড়ির মানুষের নিজেদের কোন বৈধ কাজে ব্যস্ত থাকলে তাদের উপর তিলাওয়াত শ্রবণ করা ওয়াজিব নয়। তবে প্যান্ডেল থেকে দূরে রাস্তা ও ঘর-বাড়ির পাশে মাইক স্থাপন করে দীর্ঘ সময় ধরে ওয়ায-মাহফিলের আওয়াজ দূরে পৌঁছানো উচিত নয়। কারণ এতে মানুষের কষ্ট ও তিলাওয়াতের আদব লঙ্ঘিত হয়; যা কখনোই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে জামি'আ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে ইনশাআল্লাহ। (ফাতাওয়া শামী ১/৫৪৬, ফাতাওয়া উসমানী ১/২১৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৫)

মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দূস মোল্লা
টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ

১২৬ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করছেন না। কারণটি জনৈক মুসল্লী ইমাম সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, তিনি বিবাহ করলে স্ত্রীর দৈহিক চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না। একজন মুসল্লী বলেন, ইমাম সাহেব যেহেতু অবিবাহিত, তার পিছনে নামায পড়বো না; ইমাম সাহেব হিজড়া। তিনি এই ইমামকে বিদায় করতে বলেন।

মসজিদের বাকী মুসল্লী এই ইমামকে রাখতে চান এবং বলেন, যদি এই ইমামকে না রাখা হয় তবে আমরা অন্য ইমামকে বেতন এবং খানা কোন কিছুই দিব না। কারণ চার বছর যাবত তিনি আমাদের এখানে ইমামতি করছেন। উপরোল্লিখিত সমস্যার শরয়ী সমাধান চাই।

উত্তর : ইমামতি সহীহ হওয়ার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। কেউ বিবাহ না করেও যদি নিজ তাকওয়া বজায় রাখতে পারেন, তাতে অন্যের আপত্তি করার অধিকার নেই। আর বিবাহ না করার কারণে একজন পুরুষ মানুষকে হিজড়া বলা মারাত্মক ধরনের গুনাহ, যার জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করতে হবে এবং ইমাম সাহেবের নিকটেও ক্ষমা চাইতে হবে।

তাছাড়া এ মুসল্লীর কথা অনুযায়ী যদি বাস্তবেই ইমাম সাহেব বিবাহের যোগ্য না হন, তবে তো ইমাম সাহেবের এই অবস্থায় বিবাহ করা শরীয়ত মতে জায়েযও নয়। মোটকথা, ইমাম সাহেব বিবাহের যোগ্য হোন চাই না হোন, বিবাহ না করার কারণে তার ইমামতি করতে কোন অসুবিধা নেই। কাজেই সাধারণ মুসল্লীদের সিদ্ধান্তই সঠিক। (উমদাতুর রিআয়াহ ৩/৪, আল-ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ১/২৬৫, ফাতাওয়া শামী ১/৫৫৯, ফাতাওয়া বায্যাযিয়া ১/৩৭, আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল ৫/১৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩/১১৫)

ডা. মুহাম্মদ সোহেল
উত্তরা, সেক্টর-৭, ঢাকা

১২৭ প্রশ্ন : (ক) ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর ঘরের বা অন্য কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?

(খ) যদি নাবালেগ বাচ্চার গহনা হারিয়ে যায় অথবা তার গার্ডিয়ান অন্য কাউকে দিয়ে দেয়, তাহলে এ উভয় অবস্থায়ই কি উক্ত বাচ্চাকে তার গহনা ফিরিয়ে দিতে হবে? যদি ফিরিয়ে দিতে হয় তাহলে কি সমপরিমাণ দিবে? না তার চেয়ে বেশি?

উত্তর : (ক) ইহরামের কাপড় ইহরামের কাজে ব্যবহার করার পর অন্যান্য কাপড়ের মত এ কাপড়ও অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে যেহেতু এ কাপড় দ্বারা হজ্জ-উমরার মত বরকতময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে, তাই এখন এ কাপড়টি সম্মানিত হয়ে যাওয়ায় তাকে নিম্নমানের কাজে ব্যবহার না করে সম্মানজনক কাজে ব্যবহার করতে পারলে ভালো। (আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর ১/২০৯, ২১০, মারাকিল ফালাহ শরহু নূরুল ঈযাহ; পৃষ্ঠা ৫০, উমদাতুর রিআয়াহ ১/৫৭২, রদ্দুল মুহতার ১/১০৫, ১/৩৪০, ৪/১৬১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০৫, আহসানুল ফাতাওয়া ২/১০৮)

(খ) নাবালেগ বাচ্চার মালিকানা জিনিসের হিফাযতের দায়িত্ব তার অভিভাবকদের। হিফাযত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হারিয়ে গেলে অভিভাবক এতে দায়ী হবে না এবং তার জরিমানা দিতে হবে না। তবে অভিভাবকের অসতর্কতার কারণে হারিয়ে গেলে বা অন্য কাউকে দিয়ে দিলে পরবর্তীতে এ জাতীয় জিনিস যেমন গহনা বাচ্চাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর এ জাতীয় গহনা পাওয়া না গেলে তার মূল্য দিতে হবে। (ফাতাওয়া কাযীখান ৯/১৯৪, আদদুররুল মুখতার ৫/৬৯৬, রদ্দুল মুহতার ৫/৬৮৯, ৬৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/১৫০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/১০৪, ১০৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৫/২৩২)

মু'আমালাত

মুহাম্মদ শাহনূর রহমান (শাহীন)
ফরিদপুর

১২৮ প্রশ্ন : বসবাস কিংবা ব্যবসার জন্য আমরা বিভিন্ন সময় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। আমার জিজ্ঞাসা হল,

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘর ভাড়া নেয়ার সময় কতদিন থাকা হবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না। এভাবে ঘর ভাড়া নেয়া জায়েয আছে কিনা? কেননা আমরা শুনেছি কোন বস্তুর ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(খ) অনেক সময় মালিক পক্ষ একতরফাভাবে ঘর ভাড়া বাড়িয়ে থাকে। যদিও তাতে ভাড়াগ্রহীতা রাজি না হয়। পরবর্তী সময়ে এভাবে একতরফাভাবে ভাড়া বাড়ানো জায়েয আছে কি?

(গ) ঘর ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ অনেক সময় এ্যাডভান্স নিয়ে থাকে। এই এ্যাডভান্সের টাকা কি পরবর্তীতে ভাড়া হিসেবে কর্তন করা জরুরী? যদি ভাড়া হিসেবে কর্তন না করা হয় তবে এ টাকা

কিসের ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে? উল্লিখিত মাসআলাগুলোর শরয়ী সমাধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : (ক) ঘর ভাড়া নেয়ার সময় ভাড়াকৃত বাসায় থাকার মোট সময় নির্ধারণ করা না হলেও যেহেতু মাস প্রতি ভাড়া নির্দিষ্ট করে ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করা হয়, তাই প্রথম মাসে ইজারা সহীহ হয়ে যাবে। ঐ মাসের সময় নির্দিষ্টভাবে জানা থাকার কারণে। উক্ত মাস সমাপ্তির পর মালিক ও ভাড়াটিয়া চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। অতঃপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন উভয়ের কেউ চুক্তি ভঙ্গ না করে এবং ভাড়াটিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী মাসগুলোতে থাকা আরম্ভ করে, তখন ঐ মাসগুলোতেও ইজারা সহীহ হয়ে যায়। উভয়ের মৌন সম্মতি ও প্রথার ভিত্তিতে। (ফাতহুল কাদীর ৮/৩৭, আল-হিদায়া ৩/৩০২)

(খ) যদি চুক্তির শুরুতে ইজারার সময় এক মাস বা এক বছর অথবা এর চেয়ে অধিক সময় ও তার ভাড়া নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে উক্ত মেয়াদ শেষ না হতেই ভাড়াটিয়ার অমতে একতরফাভাবে মালিক পক্ষের ভাড়া বাড়ানো জায়েয হবে না। অন্যথায় প্রচলিত নিয়মে চুক্তি হলে মাসের শুরুতে ভাড়া বাড়িয়ে দেয়া জায়েয হবে। ভাড়াটিয়া বৃদ্ধিকৃত ভাড়ায় রাজি না থাকলে বাসা ছেড়ে দিবে। (হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৪/১৩, রদ্দুল মুহতার ৬/২২, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩১৪)

(গ) ঘর ভাড়া দেয়ার সময় এ্যাডভান্স মূলত দু-এক মাস অথবা তার চেয়ে অধিক সময়ের অগ্রীম ভাড়া হিসেবে দেয়া হয়। সে হিসেবে তা ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। ভাড়া বকেয়া থাকলে তা থেকে উসূল করে নিবে। অন্যথায় তা ফেরত দিয়ে দিবে। এমনিভাবে ভাড়াটিয়া যদি ভাড়াকৃত ঘরে ইচ্ছাকৃত কোন ক্ষতিসাধন করে তাহলে মালিক সেই এ্যাডভান্সের টাকা থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহ ৫/৩৮২৪, আল-হিদায়া ৩/২৯৯)

মাওলানা মাহবূবুর রহমান
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

১২৯ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পঞ্চাশ হাজার/এক লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়। আলিয়া মাদরাসায় সহশিক্ষা চালু আছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সে একই সাথে ছেলে-মেয়েদের ক্লাস করাতে বাধ্য। কিন্তু খোদাভীতির কারণে তার অন্তরে বেপর্দায় ক্লাস করানোর ইচ্ছা নেই। এখন জানার বিষয় হল, তার এই উপার্জন হালাল কিনা?

উত্তর : ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়া জায়েয হয়নি। সেজন্য তাকে খাঁটি মনে তওবা করতে হবে। এমনিভাবে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ফরয পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করে ক্লাস করানো বা চাকুরী করা জায়েয হবে না। যদিও এতে তার বেতন হারাম হচ্ছে না। কেননা বেতন পেয়ে থাকে শিক্ষকতার বদৌলতে; যা মূলত বৈধ। নিয়মিত বাধ্যতামূলক বেপর্দেগীর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য উক্ত ব্যক্তির করণীয় হল, অন্য কোন হালাল পন্থা যাতে চেষ্টা করলে শরীয়ত বহির্ভূত কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব তালাশ করতে থাকবেন। আপাতত এই চাকুরী করবেন ও সাথে সাথে ইস্তিগফার করতে থাকবেন এবং অন্যত্র হালাল চাকুরী পাওয়া মাত্রই এটা ছেড়ে সেখানে যোগদান করবেন। (সূরা নূর-৩০, সূরা বাকারা-১৭২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৩৩৬, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪৯, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৫৯, আপকা মাসাইল আওর উনকা হল ৮/৯১, ৬/১৩০)

মু'আশারাত

মাওলানা হিলালুদ্দীন গাজীপুরী
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

১৩০ প্রশ্ন : ইউরোপ প্রবাসী দুজন যুগল মুসলমান লিভটুগেদার জীবন-যাপন করছে। এখন তারা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। বিবাহের সাক্ষীর জন্য কোন মুসলমান পাচ্ছে না; আর সহজে পাওয়ারও আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় ইসলামী বিবাহ পদ্ধতি কী হবে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মুসলিম নর-নারীর বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত আবশ্যক করেছে তার একটি হলো বিবাহের ঈজাব-কবুলের সময় সাক্ষী থাকা। আর বিবাহের সাক্ষী হল দুইজন বালেগ পুরুষ অথবা একজন বালেগ পুরুষ ও দুইজন বালেগা মহিলা এবং এদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। মুসলমান সাক্ষী ছাড়া কোনভাবেই বিবাহ সহীহ হবে না।

প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে যখন কোন মুসলমান পাওয়া যাচ্ছে না। আর সহজে আশাও করা যায় না। এমতাবস্থায় বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত এভাবে সমাধান দিয়েছে যে, ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে দেশে একটি বিবাহ মজলিসের আয়োজন করবে। অতঃপর ইউরোপে বসবাসরত ছেলে ও মেয়ে ফোন বা পত্র যোগে নিজের পক্ষ থেকে ঈজাব কবুলের জন্য ওয়াকিল নিযুক্ত করবে। অর্থাৎ ছেলে উক্ত মেয়েকে আর মেয়ে উক্ত ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেয়ার জন্য ওয়াকিল বানাবে। অতঃপর যিনি বিয়ে পড়াবেন ছেলের ওয়াকিলকে সামনে রেখে মেয়ের ওয়াকিলকে সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে এই বলে ঈজাব (প্রস্তাব) করতে বলবেন যে, আমি আমার মুআক্কিলা অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা দেন-মহরের বিনিময়ে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট বিবাহ দিলাম। মেয়ের ওয়াকিল কর্তৃক এ ঈজাবের পর ছেলের ওয়াকিল বলবে, আমি অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হয়ে এ প্রস্তাব কবুল করলাম। এভাবে উভয়ের ওয়াকিল কর্তৃক ঈজাব কবুলের মাধ্যমে প্রবাসী ছেলে-মেয়ের মাঝে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, লিভটুগেদার তথা বিবাহ বিহীন ছেলে-মেয়ের একত্রে পশুদের মত জীবন যাপন যা দুনিয়ার কোন মানব সমাজ ও কোন ধর্ম সমর্থন করে না। তাই শরয়ী বিবাহের মাধ্যমে এই অবৈধ জীবন যাপন অবশ্যই পরিহার যোগ্য এবং অতীতের জন্য তওবা করা জরুরী। (সূরা তালাক-২, মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ২৭০৬, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩০০৬, সূরা নিসা-১৪১, বাদায়িউস সানায়ে ৩/৩৯৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩২৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/২২৫)

মাওলানা শরীফ আহমাদ
মুন্সীহাটি, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

১৩১ প্রশ্ন : জনৈক যুবক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোন মহিলার সাথে যিনা করে। পরবর্তীতে সে তওবা করে ভালো হয়ে যায়। চার-পাঁচ মাস পর ঐ যুবক সেই মহিলার মেয়েকে বিবাহ করে। এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কি?

উত্তর : যিনার কারণে যিনাকারী পুরুষ ও মহিলার মাঝে হুরমতে মুসাহারাত কায়েম হয়ে যায়। অর্থাৎ যিনাকারীর জন্য সে মহিলার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সকল মহিলা চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায়। অনুরূপ যিনাকারিণীর জন্য সে পুরুষের ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সকল পুরুষ হারাম হয়ে যায়। কাজেই যিনাকারী তওবা করে থাকলে যিনার গুনাহ মাফ হতে পারে, কিন্তু সে মহিলার মেয়েকে বিবাহ করা কোনমতেই শুদ্ধ হবে না। বিবাহ করে থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য

হবে। তাদের একত্রে ঘর-সংসার করার সুযোগ নেই। (রদ্দুল মুহতার ৩/৩২)

বিবিধ

আলহাজ্জ মীর মুহসিন
নরসিংদী

১৩২ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি রাস্তার মোড়ে আল্লাহর ৯৯ নামের একটি ফলক বানাতে চায়। যার উচ্চতা হবে ৪০ ফুট। এতে খরচ হবে ৬০ লক্ষ টাকা। জনৈক আলেম বলেছেন, এটা ঠিক হবে না। কারণ এতে আল্লাহর নামের বেহুরমতী হবে।
বি.দ্র. এই ফলক নির্মাণ হলে ছয়টি দোকান ভাঙ্গা পড়বে, যার মাধ্যমে কিছু গরীব লোকের রিযিকের ব্যবস্থা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কি?

উত্তর : রাস্তার মোড়ে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের ফলক বানানো হলে তাতে পাখিরা বসে বিষ্ঠাত্যাগ করতে পারে। ধূলাবালি পড়বে। কালক্রমে ভেঙ্গে পড়বে। এ সকল কারণে আল্লাহর নামের বেহুরমতী হওয়ার কথা সঠিক। তাছাড়া রাস্তার মোড়ে আল্লাহ তা'আলার নাম লিখে ফলক বানানো এমন কোন সওয়াবের কাজ নয়, যার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করা এবং দোকান-পাট ভাঙ্গা উচিত হবে। (ফাতাওয়া শামী ৭/১৭৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩৯৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৩)

কাজী ইউসুফ
খুলনা

১৩৩ প্রশ্ন : (ক) আমাদের এলাকার কিছু ভাই বলে, আল্লাহ আল্লাহ যিকির করার কোন প্রমাণ নেই। কেননা এটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ধরনের কথা বলে তারা সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করছে। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

(খ) এটাও বলে যে, পীরের হাতে বাই'আত হওয়া শিরক। কেননা মুরীদগণ পীরের কথার উপর আমল করা ওয়াজিব মনে করে, তা শরীয়ত-সম্মত হোক বা না হোক, পীরের কথার উপর আপত্তি করা বড় অপরাধ মনে করে। নতুন কেউ পীরের মজলিসে গেলে তাকে অন্য মুরীদরা বলে যে, পীরের কোন কথার উপর আপত্তি করা যাবে না।

(গ) তারা এ কথাও বলে যে, পীর সাহেবগণ তাদের বাবার সমতুল্য বৃদ্ধ লোকদের দ্বারা শারীরিক খিদমত নিয়ে থাকে যা একটি অসামাজিক কাজ।
বি.দ্র. এ লোকগুলো অনেকাংশে মাওলানা জসিমুদ্দীন রাহমানীর বয়ানের উপর নির্ভর করে এসব বলে থাকে।

উত্তর : (ক) পবিত্র কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির কর। (সূরা আহযাব-৪২)
অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ.

অর্থ : তুমি তোমার প্রভুর নামে যিকির কর। (সূরা মুয্যাম্মিল-৮)
হাদীসেও আল্লাহর নামের যিকিরের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ তা'আলার যিকিরের বিভিন্ন বাক্য বর্ণিত হয়েছে। তার যে কোনটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা যাবে। শুধু আল্লাহ আল্লাহ শব্দের যিকিরের কথাও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর কুরআন পাকে তো আল্লাহর এবং আল্লাহর নামের যিকিরই করতে বলা হয়েছে। সুতরাং যারা বলে আল্লাহ আল্লাহ যিকির কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় তাদের কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। এমন অজ্ঞ লোকের কথা অনুসরণযোগ্য নয়। এদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। হযরত আনাস রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله.

অর্থ : এমন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকতে কিয়ামত হবে না যে বলবে 'আল্লাহ আল্লাহ'। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৮)

(খ) বাই'আত বলা হয় মূলত শরীয়তের যাহেরী-বাতেনী যাবতীয় বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত বিজ্ঞ কোন বুযুর্গের নির্দেশনা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক গড়াকে। এই বাই'আত একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবীগণ শরীয়তের বিধানাবলী পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৪৩)
সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হিসেবে আমলদার বুযুর্গের সাথে দীনের উপর চলার জন্য বাই'আত করা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে নির্দিষ্ট কোন কামিল ব্যক্তির কাছে বাই'আত করা ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়; বরং একটি মুস্তাহাব আমল। কেননা প্রয়োজন হলো কোন কামিল বুযুর্গের সোহবতে নিজের আত্মশুদ্ধী করে নেয়া।
উল্লেখ্য, হক্কানী পীর তাকেই বলা হবে যিনি তার অনুসারীদেরকে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করাবে। এ ধরনের পীর-বুযুর্গের দিকনির্দেশনায় চলার সাথে শিরকের কোন সম্পর্ক নেই। শিরক তো হয় গাইরুল্লাহর ইবাদত করলে। কিংবা গাইরুল্লাহর কোন কথাকে কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়াকে। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কিছু বিভ্রান্ত লোকের কথায় কোন বাছ-বিচার ছাড়া বাই'আত পদ্ধতিকে শিরক বলে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থ : তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে এবং তোমদের দায়িত্বশীলদেরকে...। (সূরা নিসা-৫৯)
উক্ত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূল ছাড়াও তৃতীয় আরেক শ্রেণী তথা দায়িত্বশীলদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আর দায়িত্বশীলদের অন্যতম হলেন যারা মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক আমলের সংশোধন করেন। তাহলে হক্কানী পীর যিনি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে দিকনির্দেশনা দিবেন, তার নাম পীর হলেই কি তার অনুসরণ শিরক হয়ে যাবে? মোটকথা যাদেরকে অনুসরণের কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন; গোমরাহ লোকদের অনুসরণে সে সঠিক অনুসরণকে শিরক বলার মধ্যে নিশ্চয় শিরকের আশঙ্কা রয়েছে।
হ্যাঁ, ইলম ও আমলহীন ভণ্ড লোকেরাও আজ সমাজে পীর সেজে বসেছে। যারা মাযার ভক্তি, উরস, কুলখানী, ঈদে মীলাদুন্নবী, গান-বাজনা, বেপর্দেগী এ জাতীয় অপসংস্কৃতি ও নাজায়েয কাজ নিয়ে থাকে। তাদের কার্যকলাপে শিরক আছে, তাদের কথা ভিন্ন। তাদের কথা মানা যাবে না। তাদের হাতে বাই'আত হওয়া যাবে না। যারা হক্কানী পীর ও ভণ্ড পীরের পার্থক্য না করে পীর-বুযুর্গের অনুসরণকে শিরক বলে এরাও ঐ ভণ্ড পীরদের মত আরেক শ্রেণীর ভণ্ড। এদের কথাও অনুসরণযোগ্য নয়।

(গ) জায়েযভাবে কোন কাজে সহযোগিতা নেয়া নিষেধ নয়। সেক্ষেত্রে বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। যেমন নাজায়েয কাজে অন্যের সহায়তা নেয়া নিষেধ সে ক্ষেত্রেও বয়স কোন বিষয় নয়। হাদীসে এসেছে, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বলেন, 'যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল খলা থেকে ফিরে আসলেন, আমি তাঁর হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম আর তিনি যথাক্রমে হাত, চেহারা ধৌত করছিলেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৭৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল খলায় প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর জন্য (পানি ভর্তি) উযূর পাত্রের ব্যবস্থা করলাম। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪৩)

এ সকল হাদীস দ্বারা অন্যের নিকট থেকে খিদমত নেয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অবশ্যই তা কোন বৈধ কাজ হয়।

বি.দ্র. হক্কানী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে জসীমুদ্দীন রাহমানী একজন গোমরাহ লোক। তার অনুসারীরাও গোমরাহ। আপনি যেকোন নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছ থেকে তার গোমরাহীর সনদ নিতে পারবেন। আর হক্কানী আলেমরা যাকে গোমরাহ বলবে সে যদি নিজ গোমরাহী স্বীকার না করে উল্টো আলেমদেরকে গোমরাহ বলে তাহলে বুঝতে হবে, সে গোমরাহীর সীমানা অতিক্রম করে পাগলদের কাতারে শামিল হয়ে গেছে।

মিসেস ডা. আব্দুর রব চৌধুরী
বাঁশবাড়ি, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

১৩৪ প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অন্যের শরীরের কোন অঙ্গে তা'বীয দেখে বললো, এগুলো শিরক। এই তা'বীয এখনই খুলে ফেলতে হবে। প্রশ্ন হল, তা'বীয ব্যবহারে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সবকিছু করতে পারেন। তিনি রোগ দান করেন এবং তিনিই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। অন্তরে এই বিশ্বাস রেখে শুধু অসীলাস্বরূপ শরীয়ত সম্মত তা'বীয ব্যবহার করতে শরীয়ত মতে কোন বাধা নেই। এতে কোন রকম শিরক হবে না। তা'বীয ঝাড়-ফুঁক এটা শুধু এ যামানায় নতুন নয়। বরং প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও ছিল। তিনি ঝাড়-ফুঁক করেছেন। সাহাবাগণ থেকেও তা'বীয ব্যবহারের বিষয়টি প্রমাণিত।

তবে কেউ যদি তা'বীয সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তা'বীযের মধ্যে ক্ষমতা আছে। তা'বীয বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তা'বীয ব্যবহার না করলে বা খুলে রাখলে বিরাট বিপদ হতে পারে। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে তা'বীয ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক হবে। অজ্ঞ (ইলমহীন) লোকেরা সাধারণত এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে তা'বীয ব্যবহার করে থাকে, এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা উচিত।

আর সহীহ আকীদার তা'লীম দিয়ে মুসলমানদের ঈমান আকীদা রক্ষার যিম্মাদারী উলামায়ে কেরামের উপর। এজন্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে জুড়ে থাকা ছাড়া ঈমান রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে জনৈক ব্যক্তির অন্যের শরীরে তা'বীয দেখেই তা ব্যবহার করা শিরক, এখনই খুলে ফেলতে হবে, এ কথা বলা সঠিক পথ নয়। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৩৮৯৩, বযলুল মাজহুদ, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৩, ৩৬৪, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৪৮)

মাওলানা জালিস মাহমূদ
হাজারীবাগ, ঢাকা

১৩৫ প্রশ্ন : আমরা জানি জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া মাকরূহ। ফতোয়ায়ে রাহমানিয়াতে এ বিষয়ে বাদায়িউস সানায়ে, আহসানুল ফাতাওয়ার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আর আহসানুল ফাতাওয়ায় এই আযানের জবাবকে নাজায়েয বলা হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেছেন, জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া বৈধ। তারা উদ্ধৃতি পেশ করেন ফাতহুল বারী, সিআয়াহ, ইলাউস সুনান, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী থেকে। এখন জিজ্ঞাসা হল, দলীলের আলোকে সঠিক মাসআলা কোনটি? উক্ত মাসআলায় আমাদের আকাবিরদের ফতওয়া কী? দলীল-প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনাসহ জবাব কামনা করছি।

উত্তর : * ইমাম সাহেব খুতবা শুরু করার পর থেকে শেষ করা পর্যন্ত মুসল্লীদের জন্য সব ধরনের কথাবার্তা, তাসবীহ-তাহলীল নাজায়েয। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। (বাদায়িউস সানায়ে ২/২০২, আন-নাহরুল ফায়িক ১/৩৬৪)

* খতীব সাহেবের জন্য মিম্বরে বসে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়ার অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে হানাফী উলামায়ে কেরামের কারো দ্বিমত নেই। (আত-তাজরীদ ২/৯৪৯)

* মুসল্লীদের জন্য জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মনে মনে দেয়ার অনুমতি আছে। এ ব্যাপারেও কারো দ্বিমত নেই।

* খতীব সাহেব খুতবার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠার পর মুসল্লীদের জন্য গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী দুনিয়াবী কথা বলা নাজায়েয। তবে মুসল্লীদের জন্য এ সময় দীনী কথা (যেমন তাসবীহ-তাহলীল কিংবা যিকর-আযকার) করার অনুমতি আছে কিনা? এ ব্যাপারে হানাফী মাশাইখের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। দ্বিতীয় আযানের জবাবও যেহেতু দীনী কথা (কেননা তা এক ধরনের যিকর) তাই জবাব দেয়ার বিষয়টিও মতবিরোধপূর্ণ।

কতিপয় মাশাইখ শুধু দুনিয়াবী কথাকে নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত মনে করেন। তাদের মতানুযায়ী বুঝা যায় জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মাকরূহ নয়; বরং অনুমতি আছে (কেননা জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দীনী কথার অন্তর্ভুক্ত)। আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. 'ইনায়াহ' এবং 'নিহায়াহ' গ্রন্থদ্বয়ের উদ্ধৃতিতে এ মতটি 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে (২/২৭২) উল্লেখ করেছেন এবং আল্লামা ত্বহত্বাবী রহ. হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী আলা মারাকিল ফালাহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৫১৮) এ মত গ্রহণ করেছেন।

আর অধিকাংশ মাশাইখ দীনী দুনিয়াবী সব ধরনের কথাকেই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত মনে করেন। তাদের মতানুযায়ী বুঝা যায় জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মাকরূহ। আল্লামা হাসকাফী রহ. ও আল্লামা শামী রহ. এ মত গ্রহণ করেছেন। (হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন ১/১৫৮)

আমাদের আকাবিরদের ফতওয়া

আমাদের অধিকাংশ আকাবির জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে না দিতে বলেছেন। কারণ তাদের মতে মৌখিকভাবে জবাব দেয়া মাকরূহ। মুফতী শফী রহ. বলেন,

ہمارے اساتذہ واکابر امام نے صاحب کلام کا مطلب در مختار وساتمی وغیرہ مطابق قرار دیا کہ مطلقا کلام کو ممنوع سمجھا جاوے اور اجابت اذان کو بھی اس میں داخل کیا جاوے۔

অর্থ : আমাদের আসাতিযায়ে কেরাম ও আকাবির হযরাত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিষেধাজ্ঞার (খতীব সাহেব মিম্বরে উঠার পর মুসল্লীদের জন্য কথা নিষেধ হওয়ার) ক্ষেত্র তেমনটিই বলেছেন, যেমনটি বলেছেন দুররে মুখতার এবং ফাতাওয়া শামী গ্রন্থকার। অর্থাৎ এ সময় দীনী, দুনিয়াবী সব ধরনের কথাই নিষেধ হবে এবং জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাবও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত মনে করা হবে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/৩৩২)

আকাবিরে দেওবন্দ থেকে যারা জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে না দেয়ার কথা বলেছেন তাদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলেন, রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. (ফাতাওয়া রশীদিয়া; পৃষ্ঠা ২৬০), মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ. (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/১৭৯), মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ. (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৩৫), মুফতী আযীযুর রহমান রহ. (আযীযুল ফাতাওয়া ২/৯১) ও মুফতী শফী রহ. (ইমদাদুল মুফতীন ২/৩৩৩)। এছাড়াও বর্তমানে মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. (ইনআমুল বারী ৪/৯৪) এ মত পোষণ করেন।

আর কতিপয় আকাবির যেমন আব্দুল হাই লাখনবী রহ. (আস-সিআয়াহ ২/৫৩, নাফউল মুফতী ওয়াস সাইল; পৃষ্ঠা ১৩৫, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ১/৬০৪, উমদাতুর রিআয়াহ ২/৩৩২) ও যফর আহমাদ উসমানী রহ. (ই'লাউস সুনান ২/৮০, ইমদাদুল আহকাম) জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের অনেকেই এক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়ার হাদীসের উপর কিয়াস করেছেন।

এ প্রসঙ্গে মুফতী মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী রহ. বলেন, 'যারা জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়াকে জায়েয মনে করে, তারা হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকে। আর হাদীসটি হলো, তিনি মিম্বরে বসে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দিয়েছেন। আব্দুল হাই লাখনবী রহ.-ও এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন। কিন্তু অধমের ধারণায় এর ক্ষেত্র শুধু ইমাম, উপস্থিত মুক্তাদীগণ নয়।' (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২/১৭৯)

শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর মতেও মু'আবিয়া রাযি. এর হাদীসের ক্ষেত্র শুধু ইমাম, উপস্থিত মুক্তদীগণ নয়। (আল-কানযুল মুতাওয়ারী ৬/৭৬) কারন উক্ত হাদীসের প্রেক্ষাপটে মু'আবিয়া রাযি. ইমাম ছিলেন আর ইমামের জন্য তো সবার মতেই মৌখিকভাবে জবাব দেয়ার অনুমতি আছে। (আত-তাজরীদ ২/৯৪৯) কিন্তু মুক্তাদীর জন্যও দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া যাবে এরূপ কোন ইঙ্গিত উক্ত হাদীসে নেই।

যফর আহমাদ উসমানী রহ. উভয় ধরনের হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য উভয় হাদীসের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন সাব্যস্ত করে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের মৌখিক জবাব দেয়াকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ই'লাউস সুনান ও ইমদাদুল আহকাম গ্রন্থে তার বক্তব্যের সারকথা হল, খতীব সাহেব খুতবার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠার পর থেকেই নামায ও কথা বলা নিষেধ হওয়ার হাদীস যেমন, اذا دخل احدكم المسجد والامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام (তবারানী কাবীর; হা.নং ১৩৭০৮) ক্ষেত্র হল দুনিয়াবী কথা। অর্থাৎ ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠলে দুনিয়াবী কথা বলা নিষিদ্ধ। আর আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদীস وخروج الامام يوم الجمعة يقطع الصلاة وكلامه ويقطع الكلام (সুনানে কুবরা বাইহাকী; হা.নং ৫৮৯৬) এর ক্ষেত্র হল, সব ধরনের কথা। অর্থাৎ খতীব সাহেব খুতবা আরম্ভ করলে দীনী দুনিয়াবী সব ধরনের কথা বলা নিষিদ্ধ। আর জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব যেহেতু দুনিয়াবী কথার অন্তর্ভুক্ত নয় তাই তাঁর মতে উক্ত আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে বৈধ প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাসানী রহ. খতীব মিম্বরে উঠার পর থেকেই কথা বলা মাকরূহ হওয়ার মতটিকেই অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে বলেন, 'খতীব সাহেব যখন খুতবার জন্য বের হন তখন সে খুতবা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বের হন। আর শরীয়ত মতে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত ব্যক্তি সেই কাজ আরম্ভকারীর ন্যায় (والمستعد للشيئ كالشارع فيها) এ। মূলনীতির কারণেই এ সময় নামায নিষেধ। সুতরাং খতীব সাহেব যেমনভাবে খুতবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বের হওয়ার কারণে মুসল্লীদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ, ঠিক তেমনিভাবে খতীব সাহেব খুতবা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বের হওয়ার কারণে মুসল্লীদের জন্য সব ধরনের কথা বলা নিষিদ্ধ হবে। আর হযরত আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদীসে খুতবা ব্যতীত খতীব সাহেবের কোন কাজ (যেমন, খুতবার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠা) নিষেধাজ্ঞার কারণ না হওয়ার ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। (বাদায়িউস সানায়ে ২/২০২)

সারকথা ও আমাদের মতামত

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল, জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মাকরূহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উভয় ধরনের মত আছে। তবে দলীলের ভিত্তিতে অগ্রগণ্যতার একাধিক কারণে বৈধতার মতের চেয়ে মাকরূহ হওয়ার মত বেশি মজবুত ও অধিক আমলযোগ্য।

মুফতী শফী সাহেব রহ. বলেন,

وجوہ ترجیح مختصرا یہ: (۱)اول یہ کہ کلام مطلق ہے اس کو مقید کرنیکا کوئی قرینہ کلام امام میں موجود نہیں۔(۲) احوط بھی یہی کیونکہ اجابت اذان باللسان واجب نہیں تو باتفاق یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اب جو شخص اذان ثانی کا جواب زبانی دیتا اس نے بعض مشائخ کے نزدیک مستحب پر عمل کیا اور بعض کے نزدیک ایک ممنوع کا ارتکاب کیا ایسی مشتبہ موقع میں ترک ہی میں احتیاط معلوم ہوتی ہے۔

অর্থ : মাকরূহ হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য হওয়ার কারণ হল, (১) ইমাম আবু হানীফা রহ. যে কালাম বা কথা বলাকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন তা ব্যাপকার্থে। এ কালাম বা কথাকে শুধু দুনিয়াবী কথার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কোন করীনা বা ইঙ্গিত নেই। (২) সতর্কতাও মুখে জবাব না দেয়ার মধ্যে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সাধারণ আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব। তাই জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মুখে না দিলে গুনাহ হওয়ার কোন মত পাওয়া যায় না। কিন্তু মুখে জবাব দিলে যারা বলেন মাকরূহ তাদের মতানুযায়ী গুনাহের আশঙ্কা রয়েছে। আর গুনাহের আশঙ্কা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/৩৩২)

(৩) উল্লিখিত কারণ দু'টি ছাড়াও আকাবির সাহাবাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রাযি. জুমু'আর দিন ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠার পর কথা বলা (যার মধ্যে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাবও অন্তর্ভুক্ত) অপছন্দ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৫৩৪)

তবে যেহেতু কিছু হাদীসে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সমর্থন রয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে হানাফী মাশাইখের মাঝেও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মাকরূহে তাহরীমী নয়; বরং মাকরূহে তানযীহী। মুফতী শফী রহ. আলোচ্য মাসআলাটির সমাধান অত্যান্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে এভাবেই দিয়েছেন,

خلاصہ یہ ہے کہ اذان ثانی کا جواب دینا بعض حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے بعض کے نزدیک ممنوع و مکروہ۔ اسلئے احتیاط اسی میں ہے کہ ترک کیا جاوے۔ تنبیہ: اختلاف روایات حدیث اور اختلاف مشائخ کا یہ اثر ضرور ہے کہ یہ کراہت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے جیسا کہ در مختار اور نہر کے الفاظ لا ینبغی سے معلوم ہوتا ہے۔

অর্থ : সারকথা হল, জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া কতক হানাফীর নিকট মুস্তাহাব, আর অধিকাংশের নিকট তা মাকরূহ। এজন্য সতর্কতা হল (মুখে) জবাব না দেয়া। তবে যেহেতু কিছু হাদীসে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সমর্থন রয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে

হানাফী উলামায়ে কেরামের মাঝেও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মাকরূহে তাহরীমী হবে না; বরং মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তম হবে। আল্লামা হাসকাফী রহ. ও আল্লামা সিরাজুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব মৌখিকভাবে দিতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে যে (لا ينبغى) শব্দ ব্যবহার করেছেন তা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মৌখিকভাবে জবাব দেয়া মাকরূহে তানযীহী (তাহরীমী নয়। কারণ, لا ينبغى শব্দ মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তম বুঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

সুতরাং যে সকল মুফতী সাহেব জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাবকে বৈধ বলেছেন তাদের কথা এ অর্থে সঠিক হতে পারে যে, মৌখিক জবাব দেয়া মাকরূহে তাহরীমী নয়। অপরদিকে যারা মাকরূহ বলেছেন তাদের কথাও সঠিক এ অর্থে যে, মৌখিক জবাব মাকরূহে তানযীহী।

(৩১নং পৃষ্ঠার পর; ওয়াজ মাহফিল...)

দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া এ পদ্ধতির দুরূদ, কালিমা বা যিকির নিষিদ্ধ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী ১১/১৬৭)

চা পানের প্রয়োজন হলে নিজে চা পান করে নিবেন। আর শ্রোতারা নিজ নিজ যিকিরে মশগুল হবেন।

(ঙ) শ্রোতা ও শ্রবণ

দীনী মাহফিলের শ্রোতারা তাদের নিয়তকে খালেস করে বসবেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং সাহাবায়ে কেরামদের ন্যায় দুনিয়ামুখী যিন্দেগীকে আখেরাতমুখী, সম্পদমুখী যিন্দেগীকে আমলমুখী করার লক্ষ্যে আমি দীনী কথা শ্রবণ করব। ওয়াজ নসীহত মনোযোগ দিয়ে অন্তরের কানে শোনা এবং অন্য ভাইকে পৌঁছানোর নিয়ত করা।

উল্লিখিত আলোচনার করণীয় বিষয়গুলো আমলে আনা এবং বর্জনীয়গুলো পরিত্যাগ করতে পারলে আশা করা যায় ওয়ায মাহফিল দ্বারা উম্মতের মধ্যে হেদায়াত ব্যাপক হবে এবং গোমরাহী দূরীভূত হবে। আল্লাহুম্মা আ-মীন।

লেখক : মুহাদ্দিস, তেজগাঁও রেলওয়ে জামি'আ ইসলামিয়া, ঢাকা

(২নং পৃষ্ঠার পর; সম্পাদকীয়)

মুসলমানদের মধ্যে যখন নামধারী মুসলমানের সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যায় তখন খাঁটি ও ভেজালের পার্থক্য করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিপদাপদ নাযিল করেন। সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী এটা আল্লাহ তাআলার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। আয়াতটি নাযিল হয়েছে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে। ইরশাদ করেন,.مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ..

অর্থ : আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থায়ই রেখে দেবেন যে অবস্থায় তোমরা আছো, যতক্ষণ না তিনি পাক হতে নাপাককে পৃথক করে দেন...।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, বিপদাপদ কেবল শুরু। মুনাফিক শ্রেণির মুসলমানদের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হওয়া পর্যন্ত চলবে এর ধারাবাহিকতা। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে মুসলমানদের বদ-আমলীর কারণে যখন খোদায়ী গযব নেমে আসে তখন অনেক নিরপরাধ মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকও এর শিকার হয়। আর সে কারণেই পাপীদের জন্য অন্যসব মাখলুকও বদ-দু'আ করতে থাকে। মানব শিশুরাও যদি বুঝতে পারতো, তাদের বড়দের বদ-আমলের শাস্তি তাদেরও ভুগতে হচ্ছে তাহলে তারাও অন্যান্য মাখলুকের মতো তাদের বড়দের জন্য বদ-দু'আ করতো।

খাঁটি মুমিনদের জন্য এতসব বিপদাপদ সত্ত্বেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ...

অর্থ : তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না। বিজয়ী তোমরাই হবে যদি খাঁটি মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান-১৩৯)

আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

দিয়ানতদার ছাত্রের জন্য নিগরানের প্রয়োজন নেই

মুফতী সাঈদ আহমাদ

চলতি শিক্ষা বছরের শুরুতে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'য় ছাত্রদের কানুন শুনানীর মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে মজলিসে ভর্তিফরমে উল্লিখিত দশটি অঙ্গীকারনামার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের অনুলিখন এটি। সকল তালিবে ইলমে দীনের জন্য উপকারী হবে মনে করে তা রাবেতায় ছাপা হল। -সম্পাদক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬. *এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকালে কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনের সহিত কোনভাবেই জড়িত হইব না। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেও কোন প্রকার দলাদলি করিব না।*

রাজনৈতিক দল বা ছাত্র-সংগঠন ইত্যাদির খারাবী এগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকাকালীন বুঝে আসে না; আসে পরবর্তীতে যখন আর ক্ষতিপূরণের সুযোগ থাকে না। যখন কেউ এগুলোতে জড়িয়ে যায় তখন তার কাছে খুব ভালো লাগে। আমাদের শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. বলতেন,

دو چیز باوجود نقصاندہ ہونے کے بہت مریدار ہیں ایک کھاج اور ایک راج۔

অর্থ : দু'টি জিনিস ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও খুবই মজাদার। একটা হল খুজলি-চুলকানি, আরেকটা হল রাজনীতি।

সংগঠন করা, রাজনীতি করা এক ধরনের এলার্জি। তোমরা এ ধরনের এলার্জিতে আক্রান্ত হবে না। এলাকাভিত্তিক হোক, জাতীয় পর্যায়ের হোক কিংবা আর্থিক কোন সমিতি বা সামাজিক সংগঠন হোক– কোনটার সঙ্গেই তোমরা সম্পৃক্ত হবে না। ছাত্র অবস্থায় এগুলোর সম্পৃক্ততা কতটা ভয়াবহ রকম ক্ষতিকর আল্লাহ তা'আলা সহীহ বুঝ দান করলে পরবর্তীতে বুঝে আসে। আর সহীহ বুঝ থেকে বঞ্চিত হলে পরেও বুঝে আসে না। অতএব, তোমরা নিজেরা কোন ধরনের সমিতি, সংগঠন ইত্যাদি করতে যাবে না। ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি কিংবা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা, উলামায়ে কেরামের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা, হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর বাণী– 'আমাদের কাছে সম্পদ না থাকলে আমীরগণ আমাদেরকে হাতরুমাল হিসেবে ব্যবহার করত,' অনুরূপভাবে সত্যাশ্রয়ী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার লোকদের সঙ্গে থাকবে– ইত্যাদি সকল ফযীলত যথাস্থানে সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। এগুলো বলে বলে তুমি লোকদেরকে উৎসাহও দিতে পারো, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তুমি নিজে সম্পদশালী হওয়ার চেষ্টা করবে না। উদাহরণত তুমি চিন্তা করলে– সামনে কুরবানীর মৌসুম। তো কয়েকজন সাথী-সঙ্গী মিলে গ্রামের বাড়ি থেকে কিছু গরু-ছাগল ঢাকায় এনে ছোট-খাটো একটা ব্যবসা করে ফেলি! না, এ ধরনের ক্ষুদ্র চিন্তা তোমাকে যেন পেয়ে না বসে। তোমার চিন্তা-ভাবনা তো হবে–

رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللاعداء مال.

অর্থাৎ ইলম যদি তোমার অর্জন হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে বড় সম্পদটিই তুমি অর্জন করে নিয়েছো। কাজেই এখন তুমি সম্পদ অর্জনের চিন্তা করবে না। নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচন, সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন কিংবা নিজেদের এলাকায় এখনই কোন খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য কোন সংগঠন ইত্যাদি করতে যাবে না। এটা খুবই ক্ষতিকর জিনিস।

আর রাজনীতিতে জড়ানোর তো প্রশ্নই আসে না। প্রচলিত রাজনীতি খামখেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে 'রাজনীতির মধ্যে শরীয়ত চলে না' কথাটাই বেশি প্রয়োগ হয়। যে কাজে মানুষ শরীয়তের উপরে থাকতে পারে না, সে কাজ একজন তালেবে ইলম তো দূরের কথা সাধারণ মানুষের জন্যও সমীচীন নয়।

আরেকটা বিষয় হল কোন জিহাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। জিহাদের প্রেরণা সংবলিত হাদীস من لم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق অর্থ: যে ব্যক্তি জিহাদ না করে বা জিহাদের অনুপ্রেরণাও না রেখে মৃত্যুবরণ করল, সে মুনাফিকের মত মৃত্যুবরণ করল। অনুরূপভাবে واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم এর সবই ঠিক আছে। ছাত্রাবস্থায় এগুলো প্রয়োগের সঠিক ও নিরাপদ পন্থা হল, তোমার অন্তরে জিহাদের জযবা থাকতে হবে। দুশমনদের মুকাবেলায় জিহাদের জন্য তোমার কিছু রসদ-পত্রও থাকতে হবে। তোমার জিহাদের রসদ হল, ইলমে দীনে মজবুতি অর্জন করা। তুমি যে শিক্ষা অর্জন করতে এসেছো এটা ইসলামের দুশমনদের মুকাবেলায় অনেক বড় হাতিয়ার। তুমি যদি খাঁটি আলেমে দীন হতে পারো তাহলে মনে করবে, অনেক বড় জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিতে পেরেছ। তোমার অনেক হাতিয়ার অর্জিত হয়ে গেছে। বর্তমানে ইলমের লাইনে দীনের কত দুশমন কত ষড়যন্ত্র করে চলছে। তুমি যদি সঠিক ইলমে দীন অর্জন করতে পারো তাহলে তোমার নিকট অনেক হাতিয়ার সংগৃহিত হল। তোমার লড়াইয়ের ময়দান তো অনেক প্রশস্ত। তুমি সমাজের একটামাত্র কুসংস্কার দূর করতে যাও, সমাজ থেকে বদদীনী দূর করতে যাও, দীনদারী প্রতিষ্ঠা করতে যাও– দেখবে কত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে তোমাকে পড়তে হবে। তুমি নিজেকে এই জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে থাক। আমাদের আকাবিরগণ একটা পর্যায়ে ময়দানী জিহাদের পরিবর্তে ঘরে গিয়ে জিহাদ করেছেন। আপাতত এই জিহাদে তুমি আত্মনিয়োগ কর। এখন তো তোমার সামনে ময়দানী জিহাদের প্রেক্ষাপট নেই। দৌড়ানোর পূর্বে তো তোমাকে মাঠ পরিষ্কার করে নিতে হবে। নামায আদায়ের পূর্বে তো উযূ করতে হবে। উযূ ব্যতীত নামায পড়লে তো হবে না। তোমার তো উযূর ময়দানই খালী। আমরা তো বর্তমানে উযূর অবস্থাতেই নেই। কাজেই তুমি এখন এ অবস্থায় ময়দানে গেলে ব্যর্থ হবে, তোমার জান-মাল সব খতরায় পড়বে। শরীয়তের মেজায-মর্জি ও বিভিন্ন কাজের বিচিত্র শর্তাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও অনুভূতি না থাকার ফলে এ ধরনের খামখেয়ালিপনা কখনো কখনো ছাত্রদের মধ্যে চলে আসে। নিজেদের বুঝটাকেই তারা সঠিক ও চূড়ান্ত মনে করে। এটা ঠিক নয়। তুমি তোমার বর্তমানের দায়িত্ব-কর্তব্যকেই

জিহাদ মনে করে ইলমী সাধনায় মনোযোগী হও।

বর্তমানে আমরা ময়দানী জিহাদের প্রেক্ষাপটে নেই এটা এজন্য বলেছি যে, ময়দানী জিহাদের জন্য তোমার-আমার মধ্যে যে অবস্থা ও গুণাবলী প্রয়োজন সেটা এখন অনুপস্থিত। আমরা এখন এতটাই বুযদিল যে, কী কারণে দৌড় দিচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। একবার বসুন্ধরা মাদরাসায় হযরত মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব দা.বা. আগমন করলেন। বিরাট জলসার ব্যবস্থা করা হল। উপস্থিত সকলেই উলামায়ে কেরাম। হযরত দা.বা. তখন উলামায়ে কেরামের করণীয় সম্পর্কে বয়ান করছিলেন। বয়ানের মাঝামাঝি পর্যায়ে মাঠের মাঝখান থেকে দুই-তিনজন লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। সাথে সাথে তাদের পিছনের লোকগুলোও দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পুরা ময়দান খালি। হযরত বয়ান করছেন আর এদিকে সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আমরা ছিলাম পিছনের দিকে। আমাদেরকে কেউ যাতে মাড়িয়ে না যায় এজন্য আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের স্থানেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। এদিকে মাঠের মাঝখান পুরোটাই খালি, আর স্টেজের সামনে বিশাল ফাঁকা।

পরবর্তীতে জানা গেল, ময়দানে যে চাটাই বিছানো ছিল তার নিচে একটা ব্যাঙ পড়েছিল। কেউ একজন ঐ ব্যাঙ বরাবর উপরে বসেছিল। তারপর চাপে পড়ে ব্যাঙটি উঠেছিল নড়ে, ফলে লোকটিও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কথা হল, এই লোকটি না হয় ব্যাঙের নড়াচড়ার কারণে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু আর লোকেরা তো ব্যাঙ দেখেওনি; অথচ ময়দান পুরো খালি। একেবারে অকারণেই মাঠ খালি হয়ে গেল। তো এই হল বর্তমান যামানার মুজাহিদদের মনের জোর।

একজনের কাছ থেকে শোনা- দু এক বছর আগে মুহাম্মাদপুরের বাইতুল ফালাহ মাদরাসার মাঠেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে শাইখজাদা মাওলানা মামুনুল হক সাহেব খুব ঝাঁজালো বয়ান করছিলেন। বয়ানের সময় সকলের রক্ত জযবায় টগবগ করছিল। ঠিক ঐ সময় হঠাৎ ছুটোছুটি শুরু হল। যে যেভাবে পারে পড়িমড়ি করে ছুটতে লাগল। মুহূর্তেই স্টেজ ছাড়া পুরা ময়দান এলোমেলো হয়ে গেল। পরে জানা গেল' প্যান্ডেলের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা বিড়াল উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। তো বিড়ালের এক লাফেই টগবগে রক্ত হিম হয়ে গেল। অথচ আমরা স্বপ্ন দেখি যে, জিহাদ করে এখনই দীন কায়েম করে ফেলব। এই যে অবস্থার কথা বললাম, এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তোমরা তো এখন এ ময়দানের লোক নও। যুদ্ধ কবলিত এলাকায় রণাঙ্গনে গিয়ে সাহসের পরীক্ষা দেয়া ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ তখনকার অবস্থা ভিন্ন আর তুমি এখন যে স্থানে আছো সেখানকার অবস্থা ভিন্ন। হযরত মুফতী শফী সাহেব রহ. ভর্তির সময় ছাত্রদেরকে বলে দিতেন, 'জযবাকে তাকের উপর রেখে দাও।' অর্থাৎ তোমার সকল কাজ হবে ঠাণ্ডা মাথায়। তোমার স্বভাব কখনো উত্তেজিত বা প্রভাবিত হবে না। সর্বদা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আর সভা-সমিতি, রাজনীতি, সংগঠন এগুলো সবই সাময়িক আবেগসৃষ্ট বিষয়। সাময়িক আবেগের স্থায়ী কোন ফায়দা নেই। আবেগের প্রাবল্যে কিছু করে বসা জনসাধারণের কাজ। সুতরাং এই খাতে যখন কিছু জযবা প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে, তখন তারাই এটা আদায় করে দিবে। পরে আবার দেখা যাবে যে, সে নিজেই দীনের বিধান পালনে মজবুত নেই! মূলত উলামায়ে কেরাম হলেন দীনের স্তম্ভ। তাদেরকে তো কোন কাজে হেলে গেলে চলবে না; তাদের তো স্বস্থানে মজবুতভাবে জমে থাকতে হবে। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকা খুবই জরুরী।

এখানে কয়েকটা কথা বলা হল– কোন রাজনৈতিক সংগঠনে জড়িত হওয়া যাবে না, জিহাদী সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। তোমার জিহাদের স্পৃহা আছে, সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমানে তোমার জিহাদের ময়দান ভিন্ন, হাতিয়ারও ভিন্ন। তোমার হাতিয়ার হল ইলম আর জিহাদের ময়দান হল ইলমী ময়দান।

আরেকটা কথা হল, আপোসে কোন সংগঠনে জড়িত হবে না। এ সবই একজন তালিবে ইলমের ব্যক্তিজীবনের জন্য অনেক ক্ষতিকর। সামাজিক কাজ করতে চাও, মানুষের মাঝে ইলমে দীন প্রচার করতে চাও, দীনের খিদমত করতে চাও তো সাংগঠনিক রূপ না দিয়ে, নতুন কোন নাম না দিয়ে কাজ করতে থাক। ইত্তিফাকের নাম নিয়ে কিছু করতে গেলে সেখানে ইখতিলাফ তৈরি হবে। আজ তাবলীগের কাজ সংগঠন না করে করা হচ্ছে বলে তাদের কাজ এখনো চলছে। তারা যদি একটা সংগঠন করে নিত, সাংগঠনিক নাম দিয়ে কাজ শুরু করত, খাতা-পত্র, রেজিস্টার মেইন্টেন করত তাহলে বহু আগেই এটা বিদায় হয়ে যেত। এখনো যে সমস্যা আছে এগুলো না থাকার মতোই। এগুলোতেও কোন ক্ষতি হবে না যদি সাংগঠনিক পরিচয় তাদের সামনে না থাকে।

তরুণ প্রজন্ম, মাহফিল, ইসলামী সঙ্গীত সন্ধ্যা ইত্যাদি আয়োজন করার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক।

৭. প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সুখ্যাতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কখনো কোন খিদমতের প্রয়োজন দেখা দিলে তা সানন্দে আঞ্জাম দিব।

এটা এখন তোমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। হাটহাজারীর মুহতামিম আল্লামা শফী সাহেব দা.বা. বলেছিলেন, ছাত্ররাই প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভার্টাইজ করবে। তারাই মূলত প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড। তাহলে কি ছাত্ররা পোস্টার, হ্যান্ডবিল আর মাইক নিয়ে ঘুরেঘুরে মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি প্রচার করবে? না, বরং ছাত্রদের আমল-আখলাক আর পড়াশোনার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বাড়বে। তোমরা যত সফল হবে, প্রতিষ্ঠান তত সফল হবে। ফল যত ভালো হবে, গাছের সুনাম তত বাড়বে। তোমরা হলে এই প্রতিষ্ঠানের ফল। সুতরাং (আল্লাহ না করুন) তোমরা ব্যর্থ হলে বা সফল না হলে প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ প্রমাণিত হবে, প্রতিষ্ঠানের উস্তাদগণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবেন। তোমাদের বদনাম তোমাদের উস্তাদের উপর, প্রতিষ্ঠানের উপর চলে আসবে। এ জন্য এ বিষয়ে খুব খেয়াল রাখতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের আসাতিযাগণের যথাযথ ইহতিরাম ও খিদমত করিব এবং প্রতিষ্ঠানের খাদেম ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিব ও প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রের প্রতি ভদ্র আচরণ করিব, কোন অবস্থাতেই ঝগড়া-ফাসাদ করিব না।

আসাতিযায়ে কেরাম যে পর্যায়েরই হোন না কেন, এক্ষেত্রে আমাদের সে কথাই মনে রাখতে হবে যা হযরত আলী রাযি. বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যার নিকট থেকে আমি একটিমাত্র হরফ শিখেছি আমি তার খরিদা গোলাম। আর আল্লাহ তা'আলা তো এ নেযাম ঠিক

করেই রেখেছেন যে, যে ব্যক্তি তার উপরস্থদের সম্মান করে সে তার নিম্নস্থদের থেকে সম্মান পায়। হাদীসে এসেছে,

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.

অর্থাৎ যমীনওয়ালার উপর রহম কর, উপরওয়ালা তোমার উপর রহম করবেন।

তদ্রূপ তুমি উপরওয়ালাদের প্রতি ইকরাম ও ইহতিরাম প্রদর্শন কর তোমার প্রতিও নিচেওয়ালারা ইকরাম ও ইহতিরাম প্রদর্শন করবে। আজ তুমি ছাত্র, কাল তুমিও উস্তাদ হয়ে যাবে। যদি তুমি চাও তোমার ছাত্ররা তোমাকে আদব ও সম্মান করবে, তাহলে তুমি এখন তোমার উস্তাদদেরকে আদব ও সম্মান কর। তুমি যা ভোগ-উপভোগ করবে তা তোমার এখনকার আমলের প্রতিফল। এখন যদি উস্তাদদের সাথে তোমার আদব ও ইহতিরামের সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার ছাত্ররাও তোমার সাথে আদব ও ইহতিরামের সম্পর্ক বজায় রাখবে। অন্যথায় বিপরীত প্রতিফল অনিবার্য।

৯. প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রের যথাযথ হেফাযত করিব। প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদ নষ্ট হইতে দিব না। নিজে প্রতিষ্ঠানের কোন জিনিসের ক্ষতিসাধন করিব না। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যে খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় তা গনিমত মনে করিব। কখনো কোনরূপ অভিযোগ করিব না।

কিসমতে যা আসবে তা তোমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মেনে নিতে হবে। গনিমত মনে করে তার কদর করতে হবে। মুফতী আব্দুর রউফ সাখরাবী দামাত বারাকাতুহুম আমাদেরকে মাঝে মাঝে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। তিনি তো পীর সাহেব, তার কাছে অনেক কিছু হাদিয়া আসত। হাদিয়া অধিক পরিমাণে জমা হয়ে গেলে তিনি আমাদেরকে ডেকে দস্তরখান বিছিয়ে দিতেন। বিভিন্ন প্রকার হালুয়া, মিষ্টি ইত্যাদি পেশ করতেন। আমরা দস্তরখান থেকে খাদ্যের ছোট ছোট কণাগুলো উঠিয়ে খাই কি না তা তিনি খেয়াল করতেন। এরপর বলতেন,

جو چھوٹی نعمتوں کی قدر نہیں کریگا اسکو بڑی نعمت نہیں ملیگی-

অর্থ : যে ছোট নেয়ামতের কদর করে না তার ভাগ্যে বড় নেয়ামত জুটবে না।

বলতেন, ঐ যে মিষ্টির অংশ পড়ে গেছে, উঠিয়ে খাও। এই ছোট ছোট কণাগুলোরও কদর কর।

লক্ষ্য কর, বুযুর্গানে দীনের কথা কত মূল্যবান। যা পেয়েছো তার যদি কদর না কর তাহলে পরবর্তীতে ভালোর আশা করতে পারবে না। আর যদি কদর কর তাহলে পরবর্তীতে আরও যে কত ভালো তোমার জন্য বরাদ্দ হবে তার কল্পনাও করতে পারবে না।

আসবাবপত্রের হেফাযত করা একজন তালেবে ইলমের জন্য নেহায়েত জরুরী। সবচে' গুরুত্বপূর্ণ আসবাব হল কিতাবাদি। কিতাবাদি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা, অগোছালো এলোমেলো না রাখা। যার দ্বারা তুমি ফায়দা অর্জন করবে, উপকৃত হবে তার জন্য এটুকু করা তোমার কর্তব্য। কিতাবাদির প্রতি আমাদের বুযুর্গানে দীনের সম্মান, কিতাবাদির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, মুহাব্বত ও ভালোবাসার ঘটনাবলী তোমাদের জানা আছে। তোমরা তো এখন আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর পর্যায়ে যেতে পারবে না যে, হাশিয়াটি কিতাবের বিপরীত দিকে হওয়ায় কিতাব না ঘুরিয়ে নিজেই ঘুরে যাবে। অবশ্য এতটুকু করার কারণেই তারা এত বড় হয়েছেন। আমাদের এত বড় হওয়া মনে হয় তাকদীরে নেই, এজন্য আমরা এতটুকু করিও না। তবে আমাদের অবহেলায় যেন কিতাবপত্র নষ্ট না হয় অন্তত সেদিকে তো খেয়াল রাখতেই হবে। কিতাবের তাকে দৃষ্টি পড়লেই যেন বোঝা যায়, এখানকার ছাত্রদের রুচিবোধ আছে!

এই প্রতিষ্ঠানে একটি শ্রেণির জন্য দুই-তিনটি করে কামরা বরাদ্দ। এই দুই-তিনটি কামরা সুন্দর-সুশৃঙ্খল, পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখার জন্য একজন ছাত্রই যথেষ্ট। সেই ছাত্রটি তুমিই হয়ে যাও না! হযরত আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন,

دنیا میں جتنے مناصب ہیں ہر منصب کے حاسدین ہیں ایک منصب ہے جسکا کوئی حاسد نہیں ہے وہ خادمیت کا منصب ہے حالانکہ اصل میں منصب تو یہی ہے اور جتنے مناصب ہیں وہ تو دھوکہ ہیں-

অর্থাৎ দুনিয়ায় যত পদ-পদবি আছে সবগুলোর জন্যই একদল হিংসুক আছে। কিন্তু একটা পদবি আছে যার কোন হিংসুক নেই। সেটা হল 'খাদেম' পদবি। অথচ এটাই হল আসল পদবি, আর বাকি সব ধোঁকা। হাদীসে পাকে যে سيد القوم خادمهم (জাতির নেতা তাদের সেবক) বলা হয়েছে সেটা তো এই খাদেমেরই পদ। এই পদ ও পদবি যতক্ষণ 'খাদেম' শিরোনামে থাকবে ততক্ষণ তোমার কোন হিংসুক পাওয়া যাবে না। একসময় এই 'খাদেম'-ই তোমাকে 'সাইয়েদ' বানিয়ে দিবে।

'আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে' গ্রন্থে হযরত শাইখুল আদব এজায আলী রহ. এর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার হযরতের সঙ্গে তার ছাত্ররা সফরে বের হল। সফরের শুরুতে ছাত্ররা হযরতকে আমীর বানাতে চাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমাকে আমীর বানিয়ো না। তারা পীড়াপীড়ি শুরু করলে হযরত বললেন, ঠিক আছে, আমাকে আমীর বানানো হলে কেউ আমার কোন হুকুমের বরখেলাফ করতে পারবে না। তারা এতে সম্মত হল। এরপর সর্বসম্মতিতে তাঁকে আমীর বানিয়ে দেয়া হল। সফর শুরু হলে সবাইকে এক একটা সামানা বহন করতে দিয়ে তিনি নিজে লাকড়ির বোঝাটা মাথায় নিলেন। এবার সবাই অনুরোধ করতে লাগল, হযরত! আপনি কেন লাকড়ির বোঝা বহন করবেন, ওটা আমাদেরকে দিন!? তিনি বললেন, আমি তো বলেই দিয়েছি, আমীর হওয়ার পর আমার বণ্টন নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করতে পারবে না। সুতরাং লাকড়ির বোঝা আমার মাথায়ই থাকবে। আর তোমাদের যাকে যেটা দিয়েছি তোমাদের মাথায় থাকবে। এরাই ছিলেন দেওবন্দ ও দেওবন্দিয়াতের সত্যিকার ধারক-বাহক। মোটকথা সকলেরই খিদমতের মানসিকতা থাকতে হবে।

১০. প্রতিষ্ঠানের কোন কানুন অমান্য করিলে যথোচিত শাস্তি বা বহিষ্কারাদেশ গ্রহণে বাধ্য থাকিব। এতে আমার বা আমার অভিভাবকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

এটাও এক ধরনের আনুগত্য। শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও যদি কেউ আনুগত্যের পরিচয় দিতে পারে– এর দ্বারাও মানুষ মকবূলিয়াত তথা গ্রহণযোগ্যতার স্তরে থাকতে পারে। মনে কর, কোন কানুনের বরখেলাফ হওয়ায় কারও ব্যাপারে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তো এই মুসিবতের সময়ও সে যদি অভিযোগ না করে দোষটা নিজের ওপর চাপিয়ে ফয়সালাটি মেনে নেয়, তাহলেও একজন ছাত্র উস্তাদদের বদদু'আ থেকে রক্ষা পায়। তো উস্তাদদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ছাত্রটি চলে গেল এবং যাওয়ার সময় উস্তাদদের নিকট থেকে দু'আ নিয়ে গেল যে, আমার জন্য দু'আ করবেন, আমি যেন বাকি জীবন ইলমে দীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারি। তাহলে এ ছাত্রের জন্য উস্তাদগণ অন্তর থেকে দু'আ করবেন, যেন ছেলেটা দীনের খিদমত আঞ্জাম দিতে পারে। তা না করে যদি সিদ্ধান্ত

হওয়ার পর ইবলিসী পন্থা অবলম্বন করে যে, আমার প্রতি অবিচার করা হয়েছে, অথবা সিদ্ধান্তটি এভাবেও করা যেতো ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহলে এতে ছাত্রের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তখন আর এ ছাত্রের সংশোধন হয় না।

মোটকথা, বান্দা মুসিবতে পড়েও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে যদি সে অপরাধকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে।

হযরত যুন্নুন মিসরী রহ. এর ঘটনা। পুরো শরীর চাদরাবৃত করে তিনি মিসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর ধারণা, তাঁরই অপরাধের কারণে ইস্তেসকার নামায পড়েও মিসরবাসী বৃষ্টির দেখা পাচ্ছে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমার মত অপরাধীর এখানে থাকা সমীচীন নয়। এজন্য তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অথচ বাস্তব অবস্থা তা নয়। যুন্নুন মিসরী তো সে যুগের প্রথম স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন বুযুর্গের কাছ থেকে এই বিনম্র অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলেন, তখন এই উসিলায় সমগ্র মিসরবাসীকে বৃষ্টি দান করলেন। তো তোমরাও যুন্নুন মিসরীর অনুরূপ হয়ে যাও। যখন দেখবে, কোন কারণে শাস্তি হচ্ছে বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে তখন নিজেই নিজেকে অপরাধী মনে করবে।

পক্ষান্তরে নিজের অপরাধের অপব্যাখ্যা করে অন্যদেরকে অপরাধী বানানো আর গৃহিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগের পন্থা অবলম্বন করা মানুষকে আরো বঞ্চিত করে দেয়, আরো দূরে সরিয়ে দেয়। এজন্য কখনো যদি কোন শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত আসে সেক্ষেত্রে ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين এর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-এর মাধ্যমে বনী আদমের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছেন যে, ভুল করলে তা স্বীকার করে নিবে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে না।

আজকের আলোচনার সর্বশেষ বিষয় হল, মোবাইল। তোমরা 'উসূলে ইফতা'র শেষে দেখবে, হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কী পন্থায় ইলমে দীন অর্জন করলে একজন ব্যক্তি ইলমে দীনের ফকীহ হতে পারে? হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. জবাব দিলেন, একাগ্রতার উপস্থিতি এবং সব ধরনের সম্পর্ক কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইলমে দীন অর্জন করতে পারবে। তুমি তোমার সবটুকু বিলিয়ে দেয়া ব্যতীত ইলম তোমাকে তার সামান্য অংশও দিবে না। এজন্য তোমাকে একাগ্রতা বিনষ্টকারী সকল জিনিস ত্যাগ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা রহ.কে আবার প্রশ্ন করা হল, সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে? কারণ দুনিয়া তো দারুল আসবাব, সম্পর্ক এখানে থাকতেই পারে; থাকতেই হয়। সম্পর্ক ছাড়া তো দুনিয়াতে চলা অসম্ভব! তিনি বললেন, একান্ত প্রয়োজনীয়টুকুই গ্রহণ করবে; এর বেশি নয়।

উদাহরণত তুমি মাদরাসায় পৌঁছে গেছো, এটা বাড়িতে জানানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাদরাসায় এসে একটা ফোন করলেই প্রয়োজন পুরা হয়। কিন্তু এর জন্য তো তোমার কাছে একটা মোবাইল রাখার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া নতুন নতুন সব ফিতনার মূল হল এই মোবাইল। অবৈধ সম্পর্ক তো বলাই বাহুল্য, বৈধ সম্পর্কও একাগ্রতা বিনষ্টকারী। নানা রকম সম্পর্ক ছাড়াও ফিতনা-ফাসাদ ও অন্যায়ের যত গলি-ঘুপচি রয়েছে, মোবাইল তোমাকে সব সহজলভ্য করে দিবে। এজন্য দীনী হোক বা দুনিয়াবী হোক বিবেকবান সকলেই ছাত্রদের জন্য মোবাইল রাখা ক্ষতিকর মনে করে। এটা ছাত্রদের যোগ্যতা এবং একাগ্রতার জন্য বিষতুল্য।

মানুষ যখন কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করে তখন তার ভেতর সে জিনিসের প্রয়োজন ও গুরুত্ব দিন দিন বাড়তেই থাকে। আর যখন প্রয়োজন মনে করে না তখন ধীরে ধীরে এর গুরুত্বও তার অন্তর থেকে কমে যায়। উদাহরণত প্রতিদিন মাদরাসার দফতরে গিয়ে পত্রিকা না দেখলে মনে হয় কী যেন অপূর্ণ রয়ে গেল! কিন্তু যখন ৬/৭ দিনের জন্য বাড়িতে যাওয়া হয় তখন একদিনও পেপার-পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। অথচ এর জন্য তখন অপূর্ণতা অনুভব হয় না। এর সরল অর্থ হল, যখন নিয়মিত পত্রিকা পড়েছি তখনও উল্লেখযোগ্য কোন ফায়দা হয়নি আবার যখন পড়িনি তখনও উল্লেখ করার মত কোন ক্ষতি হয়নি। কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম, ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। এই সংবাদ জেনে আমার এমন কোন ফায়দা হয়নি যেটা উল্লেখ করার মত। আর যারা দেখেনি তাদেরও কোন বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যায়নি।

তোমার ধারণা, তুমি যখন বাড়িতে যাবে তখন এই ৫/৬ দিন তোমার কাছে মোবাইল থাকলে ভালো হবে। এই যে তুমি ভালো হবে মনে করেছো, এতে একসময় মাদরাসায় লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যবহার করাও ভালো মনে হবে। ধীরে ধীরে তোমার পড়া-শোনা আদব-আখলাক সব লাটে উঠবে।

(৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইসলাহী মজলিস

প্রতি আরবী মাসের ৩য় বৃহস্পতিবার

(মজলিসে আইম্মায়ে মাসাজিদের আগের রাত)

সময়
বাদ মাগরিব থেকে বাদ ফজর পর্যন্ত

মা'মূলাত

তিলাওয়াত, মালফূযাতের তা'লীম ও যিকর, তাযকিরাতু আহলিল্লাহ, আমলী মশক, আত্মশুদ্ধিমূলক বয়ান ও প্রশ্নোত্তর, তাহাজ্জুদ, তাসবীহাতের আমল, ইজতিমায়ী দু'আ ইত্যাদি।

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

স্বপ্নের স্বপ্নধারা হাউজিং

আমি তখন হিফযখানায় পড়ি। সবেমাত্র পনেরো পারা শেষ হয়েছে। একদিন শুনতে পেলাম, আমাদের মাদরাসায় মাহফিল হবে। আমার আনন্দ যেন আর ধরে না। শুধু প্রহর গুণছিলাম, কবে আসবে সেই শুভ দিন। দিন-রাত গুণতে গুণতে সময় যেন আর শেষ হয় না। অপেক্ষার অস্থির মুহূর্তগুলো অধীর আগ্রহে পার করছিলাম। তারপর একদিন সেই দিনটির আগমন ঘটল। জানতে পারলাম, মাহফিলের মধ্যমণি হলেন ইলমী দুনিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র ঐতিহ্যবাহী জামিআর রাহমানিয়ার শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.। তিনিই আমাদের হাফেয ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান করবেন।

নির্ধারিত সময়ে মাহফিল শুরু হল। তিনি ধীর পায়ে মঞ্চে আরোহন করলেন। যেন নূরানী এক ফেরেশতা আসমান থেকে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাকে মন ভরে দেখলাম। তারপর শুভ ইচ্ছাটা হঠাৎ করেই মনের মধ্যে জায়গা করে নি– একদিন আমি তার ছাত্র হবো; তার সামনে হাঁটু গেড়ে হাদীসে পাকের তালীম গ্রহণ করবো। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমার সেই লালিত স্বপ্ন স্বপ্নধারা হাউজিংয়ে পূরণ হল। আজ আমি রাহমানিয়ার ছাত্র। মুফতী সাহেবের রূহানী সন্তান। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

মুহাম্মাদ যুবাইর ইবনে মাসউদ
জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া, ঢাকা

শুশুক

বাড়িতে কেউ নেই। একা একা মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে। চলে এলাম নদীর কাছে। মন খারাপ হলে আমি নদীর সান্নিধ্যে চলে আসি। তখন মনটা ভালো হয়ে যায়। নদীর বুক চিরে বয়ে চলছে পালতোলা নৌকা। জাল ফেলে জেলেরা ধরছে মাছ। দূরে বালিহাঁসগুলো খেলছে ডুব-সাঁতার। আর আমি তীরে দাঁড়িয়ে দেখছি কুদরতের কারিশমা। ঝাঁঝালো রোদে শরীরটা চিটমিট করছে। ভাবলাম, এসেছি যখন শরীরটা জুড়িয়ে যাই। নেমে পড়লাম নদীতে। কিছু দুরন্ত বালক সাঁতার কেটে কেটে গভীর পানিতে চলে গেল। ঢেউয়ের ওঠানামায় তাল মিলিয়ে ওরা আনন্দ করছিল। খুব ভালো লাগছিল আমার। গোসল প্রায় শেষ। এমন সময় মাঝ নদীতে ভুস করে ভেসে উঠেই ডুব দিল কি একটা অদ্ভুত প্রাণী। ভয় পেয়ে দ্রুত তীরে উঠে এলাম। পরক্ষণেই মনে পড়ল দাদুর বলা 'শুশুক' মাছের গল্প। এগুলো স্তন্যপায়ী প্রাণী। এমনিতেই মাঝে-মধ্যে পানির ওপর ভেসে ওঠে। আবার নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে পরক্ষণেই ডুব দেয়। এবার ভয় কেটে গিয়ে মনের মধ্যে পুলক অনুভব করলাম। শৈশবে দাদুর কাছে অনেক শুনেছি শুশুকের কথা; দেখা হয়নি কখনো। আজ আল্লাহ আমাকে গল্পের শুশুক বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন।

মুহাম্মাদ নাসরুল্লাহ
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সোনালী সকাল

শুক্রবার। ফজরের পর মসজিদে সূরা ইয়াসীন, মাসনুন দুআ ও জুমু'আর দিনের ফযীলত তালীম করা হল। আমার দু'চোখ তখন রাতজাগা প্রহরীর মতো ঘুমে ঢুলুঢুলু। মসজিদ থেকে বেরোনোর পর সকালের মৃদুমন্দ বাতাস কখন যে ঘুমটাকে তাড়িয়ে দিল বুঝতেই পারিনি। কিছুক্ষণ পর সূর্য উদিত হল। সূর্যের নরোম কোমল সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিক। সে কি মনোরম দৃশ্য। বহুদিন পর মনে পড়ল চমৎকার সে কবিতাটি–

তুলি দুই হাত করি মুনাজাত
হে রহীম রহমান,
কত সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছো দান।

আজকের সকালটি আমার মনে এক অদ্ভুত ভালোলাগা সৃষ্টি করল। মনে পড়ল, আজ দু'আ কবুলের দিন। আজ গুনাহ মাফের দিন, নেকী অর্জনের দিন। স্মৃতিতে ভেসে উঠল আল্লাহর নাশোকরী ও গাফলতের ঘোরে কাটানো দিনগুলোর কথা। অশ্রুতে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন আমায় ডেকে বলছে, কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার? তোমার সকল দুঃখ ও বেদনা, তোমার সকল অপ্রাপ্তি ও কামনা আল্লাহর কাছে তুলে ধরো। তিনি তো রহীম-রহমান! তিনি তো গাফুর-গাফফার! আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে সবখানে সর্বাবস্থায় তারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আমার সকল আকুতি ও মিনতি তাকেই জানাতে হবে। হে দয়াময়, পরম দাতা! হে দীন-দুনিয়ার মালিক! আমার ভালো ও মন্দ এবং আমার আশা ও আশঙ্কা কিছুই তোমার অজানা নয়। তুমি আমার এবং আমাদের পাপগুলো মার্জনা করো। না বলা আশাগুলো পূর্ণ করো। আমাদেরকে সরল পথ ও সঠিক সমঝ দান করো। আর নসীব কর আমলী জীবন ও ঈমানী মৃত্যু। আমীন।

নাজমুল ইসলাম ফরিদপুরী
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা

হে আল্লাহ! ফিরিয়ে দাও আমার বন্ধুকে

আমার পাঁচ বছর বয়সে আব্বু আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমার খেলার সাথী প্রতিবেশী জুনাইদ ভর্তি হল মাদরাসায়। তাকে দেখে আমারও মাদরাসায় পড়ার আগ্রহ হল। আব্বু-আম্মুকে আমার আগ্রহের কথা জানালে তারা খুব খুশি হলেন। তবে কিছুটা আশ্চর্যও হলেন। কারণ, আমার আব্বু-আম্মু, ভাই-বোন সবাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এককথায় স্কুল-কলেজের মানুষ। আব্বু-আম্মু আমার ইচ্ছাকে সম্মান জানালেন। বন্ধু জুনাইদের সাথে আমাকেও মাদরাসায় ভর্তি করে দিলেন। বেশ ভালোই চলছিল আমার নতুন শিক্ষাজীবন। কয়েক বছর পর আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক বছর মাদরাসায় যেতে পারলাম না। আমাকে ছাড়া বন্ধু জুনাইদের সময়টাও ভালো কাটেনি। সে আমাকে খুব মুহাব্বত করত। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে এক সময় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। দীর্ঘ এক বছরের অনুপস্থিতিতে আমি পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে পড়ি। আমার ইচ্ছা ছিল, বন্ধু জুনাইদ আর আমি একসাথে কুরআনের হাফেয হব। আল্লাহ তা'আলা আমার আশা পূরণ করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করে আমি বন্ধুর সঙ্গেই হিফয সমাপ্ত করেছি। এবার মাওলানা হওয়ার পালা। কিন্তু এত বছরের সহপাঠী প্রিয় বন্ধু জুনাইদ হিফয শেষ করে মাদরাসা ছেড়ে চলে গেল। তার ইচ্ছা সে স্কুলে পড়ে সার্টিফিকেট অর্জন করবে। বড় বড় পদে চাকুরী করবে। অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করবে। আমি তাকে অনেক বোঝালাম। তাকে বললাম, মাদরাসা ছেড়ে দিলে তোমার আমল-আখলাক ভালো থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। আমার শত চেষ্টাতেও সে বুঝল না। নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইল। জানতে পারলাম, তার এ সিদ্ধান্তে তার পিতা-মাতারও সমর্থন রয়েছে। তখন আরো বিস্মিত ও মর্মাহত হলাম। আফসোস হল। তার পিতার কাছে গিয়ে তাদেরকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তারাও তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে আমি ব্যর্থ হলাম আমার বন্ধুকে ইলমে দীনের খাদেম হিসেবে ধরে রাখতে। আল্লাহ তাআলা যথার্থ বলেছেন– 'এটা আল্লাহর অপার অনুগ্রহ, যে তা

(একান্তভাবে) কামনা করে তাকেই তিনি দান করেন।' জুনাইদের জন্য এখনো আমার মন কাঁদে, আমার চোখ অশ্রু ঝরায়।

তোফায়েল আহমদ তাকী মোমেনশাহী
জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

যে যাকে চায় সে তাকে পায়

ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ের আকুতি। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। প্রথম সাক্ষাতেই মানুষ কাউকে ভালোবেসে ফেলে। আবার দীর্ঘদিনের চলাফেরায় সৃষ্টি হয় কারো প্রতি গভীর অনুরাগ। কিন্তু আমি একজনকে ভালোবেসেছি কেবল তার নাম শোনে। আমার সেই ভালোবাসার মানুষটি উম্মতের অন্যতম রাহবার হযরত মাওলানা উমর ফারুক সন্দ্বিপী দা.বা.। অনেক ইচ্ছে ছিল– তার সাথে একটু সাক্ষাত হবে, দু-চারটা কথা হবে, একটু দু'আ নিব। কিন্তু আমার সে ইচ্ছা কি কখনো পূরণ হবে? আমি পল্লীগাঁয়ের তালিবে ইলম, আর হুযূর থাকেন রাজধানী ঢাকায়। তবুও কেন যেন মনে হতো একদিন পাবোই পাবো তার সাক্ষাত।

আল্লাহর অপার মহিমা! একদিন মুহতামিম সাহেব বললেন, আগামীকাল সন্দ্বিপী হুযূর একসফরে আমাদের মাদরাসায় সামান্য সময় বিশ্রাম নিবেন। শুনে আমার হৃদয়ের শুষ্ক মরুভূমিতে যেন বারি বর্ষণ হল। আমি আনন্দে আপ্লুত হলাম। এবার প্রতীক্ষার পালা, কখন নতুন সূর্য আগামীকালের পয়গাম নিয়ে আসবে। সূর্য উঠল এবং সকাল পেরিয়ে দুপুর হল। জানতে পারলাম হুযূর ঢাকা হতে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ এক দুঃসংবাদ! হুযূরের গাড়ি নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শুনে আমার বুক যেন চূরমার হয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠলাম, হায়! তাহলে কি আমার আশা আর পূরণ হল না! হুযূরের সাক্ষাত কি তাহলে আর মিলল না! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম হুযূর কেমন আছেন তা জানার জন্য। আল্লাহ তাআলার লাখো শোকর! মুহতামিম সাহেব কিছুক্ষণ পর আমাদেরকে জানালেন, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলেও হুযূর মাশাআল্লাহ সুস্থ আছেন এবং গাড়ি রওয়ানাও হয়ে গেছে। আমার আশার আলো আবারো উজ্জ্বল হতে লাগল। একসময় অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে হুযূরের গাড়ি মাদরাসার মাঠে এসে থামল। আমি দৌড়ে গেলাম এবং হুযূরের চেহারা মুবারক দর্শন করে প্রশান্ত ও আপ্লুত হলাম। তার সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করলাম।

সফর-ক্লান্ত হুযূর বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন। আমরা কয়েকজন সহপাঠী সাধ্যমতো তার খিদমত করলাম। হুযূরের সফর-সঙ্গী হাসিব সাহেব আমাদেরকে অ্যাক্সিডেন্টের ভয়াবহতার বিবরণ দিলেন। হুযূরের গাড়িটি অন্য আরেকটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। এতে হুযূরের গাড়ির একপাশ দুমড়ে মুচড়ে গেলেও কিভাবে যেন সেটা আবার সোজা হয়ে যায় এবং চলতে শুরু করে। এ দৃশ্য দেখে ট্রাফিক পুলিশসহ পথচারীরা সকলেই অবাক হয়ে যায়। আল্লাহ যেন তাঁর প্রিয় বান্দাকে তার কুদরতী হাতে হেফাযত করেছেন। সুযোগ পেয়ে হুযূরকে জিজ্ঞেস করলাম, চোখের গোনাহ থেকে বাঁচার উপায় কি? হুযূর বললেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর চোখের গুনাহের কথা স্মরণ করে সাতবার لا حول ولا قوة الا بالله পড়বে। এবং এর উসিলায় আল্লাহ তা'আলা যেন উক্ত গোনাহ থেকে নাজাত দেন সে জন্য দু'আও করবে। সেদিন বাদ মাগরিব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হুযূর কিছু মূল্যবান নসীহত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা যে আমাকে আজ ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট সত্ত্বেও নিরাপদে রেখেছেন তা একটি ছোট্ট আমলের বদৌলতে। এজন্য তালিবে ইলম যেন তার ইলম অনুযায়ী আমলী যিন্দেগী গঠনে তৎপর হয়।'

আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ
জামি'আ হুসাইনিয়া আরাবিয়া, আগারগাঁও, ঢাকা

বৈশাখের স্মৃতি

সকাল নয়টা। ক্লাসের ঘন্টা বেজে উঠেছে। ছাত্র ভাইয়েরা সবাই নিজের মতো করে ক্লাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেউ খাতা-কলম গুছিয়ে নিচ্ছে। কেউ পড়ার টেবিল নিয়ে টানাটানি করছে। কেউ আবার সবক ইয়াদ হয়নি বলে ধুমসে পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শুরু হল ঝড়। প্রচণ্ড বাতাস আর বিকট শব্দে পশ্চিমের সবক'টা জানালা ধুপধাপ বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্র ভাইয়েরা আরম্ভ করল ছুটোছুটি। কেউ গেল জানালার পাশ থেকে কিতাব-পত্র সরাতে, কেউ গেল শুকাতে দেয়া কাপড় গুটিয়ে আনতে। এদিকে আমি রুমের এককোণে জড়োসড়ো হয়ে দু'আ-কালাম যা মনে আসছিল বিড়বিড় করে পড়তে লাগলাম। কারণ ঝড়-তুফানকে আমি ভীষণ ভয় করি। আমার এ ভয়ের পেছনে আছে এক ভয়াবহ ইতিহাস।

আমার বয়স তখন সাত কি আট বছর। বৈশাখ মাস। এ সময় আমাদের দেশে প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হয়। যেদিনকার ঘটনা, সেদিনও সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ জমেছে। বাসায় আম্মু, আমি, ছোট দু'বোন আর আমাদের পরিবারের নতুন সদস্য ছোট্ট সাকিব। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। বাতাস পড়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো নড়াচড়াহীন। কেমন একটা গুমোট পরিবেশ। ইশার ওয়াক্ত হলেও তখনো আযান পড়েনি। আম্মু আমাকে বললেন, তুমি সাকিবের পাশে বসো, আমি উযূ করে তাড়াতাড়ি নামাযটা পড়ে নিই। আবার ঝড়-তুফান শুরু হলে ঝামেলা। আম্মু এখনো ঘর থেকে বের হননি, এরই মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গেল। অন্ধকারে ছেয়ে গেলো পুরো ঘর। আচমকা শুনতে পেলাম ভয়ঙ্কর এক আওয়াজ। সমুদ্রের পাড়ে যেমন সারাক্ষণ শোঁ শোঁ শব্দ হতে থাকে আওয়াজটা ঠিক তেমন। তবে সমুদ্রের ঢেউ নয়; ভয়ঙ্কর আওয়াজে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ ঝড়। দানবীয় বাতাস ঠিক যেন আমাদের চারচালা ঘরের উপর আছড়ে পড়ছে। বাতাসের ধাক্কায় আমাদের ঘরটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে বারবার। জড়োসড়ো হয়ে খাটের এক কোণে মায়ের আঁচল আঁকড়ে বসে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাইরের খড়কুটা আর ধূলোবালি সব আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি এতো ধূলোবালি আসছে কোত্থেকে? আম্মু বললেন, হয়তো বেড়ার কোন টিন খুলে গেছে, চলো, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি। বারান্দায় ছোট একটি নড়বড়ে চৌকি পাতা। আম্মু আমাদেরকে নিয়ে চৌকির উপর বসলেন। আমরাও একেবারে মায়ের কোল লেপ্টে বসে পড়লাম। আম্মু গুনগুন করে কী যেন পড়ছিলেন। আমিও আল্লাহর নাম জপছিলাম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে।

তারপর শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি। এরই মধ্যে বিকট আওয়াজে বিদ্যুৎ চমকালো। আর তখনই টের পেলাম ঘটনাটা কী ঘটেছে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখি, মাথার ওপর থেকে পুরো চালটাই উধাও। বাতাসের ঝাপটায় উড়ে গেছে। আশ্চর্যের কথা হল, ঝড় এতো বড় চালটাকে তুলে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু চারদিকের বেড়াগুলো তেমনি বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় আধঘণ্টা প্রবল বাতাস আর ভারী বর্ষণের পর পরিস্থিতি আস্তে আস্তে শান্ত হতে লাগল। ঝড় থামতেই প্রতিবেশিরা ছুটে আসতে লাগলো আমাদের বাড়িতে। এভাবেই শেষ হলো জীবনের ভয়াবহ ক'টি মুহূর্ত।

এক যুগেরও অধিককাল পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সেই দুঃসহ রাতের কথা এখনও আমার স্মৃতিতে অবিকল। আজও বিদ্যুৎ চমকালে আমি চমকে উঠি। আকাশ কালো দেখলে শিউরে ওঠে আমার মন।

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা